অরণি নগর

চতুর্থ সংখ্যা ২০১৪

বাউল ফকির উৎসবের পত্রিকা

সহজ ধারা সঙ্গ কর

আরশিনগর

চতুর্থ বর্ষ

আরশিনগর
চতুর্থ প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৪

© বাউল ফকির উৎসব কমিটি

প্রকাশক : বাউল ফকির উৎসব কমিটি

প্রচ্ছদ : অমিত রায়
অক্ষর বিন্যাস : তাপস রায়
মুদ্রক : টালিগঞ্জ প্রেস, কলকাতা ৭০০ ০৩৩

সম্পাদক : অরূপ দাস
সহ সম্পাদক : স্রোতা দত্ত

অনুদান : ৬০ টাকা

গৌর কূলে কুল মিলাব গো ...

মরণ কারও কথা শুনে না
যখন তখন যেথায় সেথায়
দিতে পারে সদাই হানা

জাল পেতে ওই মরণ ছলে,
মহামায়া নেয় যে কোলে।
কথায় কথায় মানুষ বলে,
আমার বলতে কেউ রইল না।।

বেঁচে আছ এই আশ্চর্য,
নাইকো কারও ব্রহ্মচর্য
থাকতে যদি একটু ধৈর্য
ঐশ্বর্য আর গায়ে ধরত না।।

মরবে বলে মনে রেখ
বেশিদিন বাঁচবে দেখ।
কথার মতো কথা শেখ,
মরণের দিন যাবে জানা।।

নিজের হাতে বাঁচন-মরণ,
ভবা পাগলার সত্য বচন
তারে বলে রাখলে শরণ
অকালে মরতে হতো না।।

সূচিপত্র

আমাদের কথা ৭

ত্রিভুজের এক বাহু ১৩
হিরণ মিত্র

খ্যাপার মন ২১
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

স্মৃতির আলোকে গৌর খ্যাপা ২৭
প্রশান্ত চন্দ্র রায়

আর কীই বা করতে পারি ৩৫
সৌমা চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ গৌর খ্যাপা ৪১

রুচির যোশীর তোলা সাদাকালো ছবি ৫০

সুবলদা ৫৫
লীনা চাকী

শব্দ, বিপজ্জনক ও আক্রান্ত শব্দ বিষয়ে ভাবনা ৫৯
সুকান্ত মজুমদার

"... তারাপীঠ মহাশ্মশানে তীব্র উন্মাদ অনুরাগে, নির্দিষ্ট কুম্ভক-পাকের মোচড়ে, ঝাঁকড়া-সজাগ মাথা ভর্তি চুল চামরের ছন্দে, মেরুদণ্ডের হাতে দুলিয়ে খমকের সটান-তীক্ষ্ণতায়, দুপায়ের আকস্মিক বজ্রযানী লাফে, মর্মপ্লাবী দুচোখের ভাসমানতায়, ঠোঁটের অনাথ-চড়ুই উদ্বেগে, বীরভূমের নাগার্জুন-প্রতিম বাউল গৌর খ্যাপা ঘটিয়ে তুলছিল এমন এক আত্মনিবেদনের জগৎ, এমন এক আত্মবিস্ফোরণেরও ছবি, যার কোনো সংজ্ঞা হয় না..."

'দাহপত্র' প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত দীপক মজুমদারের লেখা 'মন-গোয়ালা তারাপীঠ গৌর গাঙ্গিনিৎসে'-র অংশ থেকে উদ্ধৃত।

বানান অপরিবর্তিত

আমাদের কথা

নয় নয় করে বাউল ফকির উৎসব ন'বছরে পড়ল। প্রতিবারের মত উৎসবের মাস দুই আগে থেকে উৎসব হওয়া না হওয়ার দোলাচল কাটিয়ে শেষমেশ মাঠে নেমে পড়ার প্রক্রিয়া যখন অব্যাহত, দেখা গেল আগের লোকজনের অনেকেই সে ভাবে আর নেই। কেউ কেউ হয়তো গতানুগতিকতায় ক্লান্ত, খানিক হয়তো বন্ধুবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের শীতলতা, অনেকেরই অবশ্য ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি সব মিশিয়ে আয়োজকদের অবস্থা কিছুটা এলোমেলো। এতো গেল আয়োজকদের কথা, কিন্তু অগুন্তি দর্শক - শ্রোতা, পাড়া-পড়শি, শুভানুধ্যায়ীরা তো অপেক্ষা করে বসে আছেন কবে উৎসব শুরু হবে। অপেক্ষা করে বসে আছেন শিল্পীরা, যাঁরা শহরের বুকে একচিলতে মাঠে দুদিনের এই পরবে গান গেয়ে বড় তৃপ্তি পান, তাঁদের গান গাওয়ার খিদে মেটে। পারস্পরিক এই প্রত্যাশার ভালোলাগা যেমন আছে, তেমনি থাকে চাপ - সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চালানো। টাকা-পয়সা জোগাড়যন্ত্র, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা - তাদের থাকার ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ছাড়পত্র এবং স্থানীয় অঘোষিত অভিভাবকদের অনুমোদন আদায় ইত্যাদি। এসব কথা 'আরশিনগর' এ থাকা প্রাসঙ্গিক কি না এরকম প্রশ্ন উঠতেই পারে, তবে উৎসব ছাড়া এই 'আরশিনগর' এর অস্তিত্ব নেই। উৎসবের দিনে রং করা মূর্তির আড়ালে বাঁশ খড়ের প্রকট হয়ে পড়া কাম্য নয়, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটু ধ্যান ধারণা থাকা সকলেরই দরকার বলে আমাদের মনে হয়েছে।

শহর কলকাতা ও আশেপাশের শ্রোতা-দর্শক-ভক্তদের কাছে একটি আর্জি আছে। ফকির-বাউল-আখড়ায় নেশার কিঞ্চিৎ চল থাকলেও শহরে তাদের সমাবেশ মানেই নেশায় আপ্লুত হয়ে পড়া নয়। বাউল

ফকিররাও তা চান না। অজয়ের পাড়ে যা চলতে পারে, শহরের মধ্যে একটা পাড়ায় যে তা চলে না এটা সম্বন্ধে তাঁদের ওয়াকিবহাল হতে হবে। যে সব স্থানীয় মানুষ সকলের কথা ভেবে অনেক রকমের অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নেন, তাঁদের প্রতি সৌজন্য বশত আধ্যাত্মিক গান প্রেমী দর্শককূল কিঞ্চিৎ সংযমী আচরণ করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। আশা করব এই সহবত পালনে সকলে সহযোগিতা করবেন।

ছেড়ে গেছে সোনার গৌর আর তো পাব না। উৎসব মানে আনন্দ, কিন্তু এবার যেন বিষাদের ছায়া বারবার এসে পড়ছে। সুবল দা গত হয়েছেন প্রায় দুবছর। বছর গড়াতে চলল গৌরের অপঘাতে চলে যাওয়া। ৫০ পেরোতে না পেরোতে আমাদের বন্ধু এবং একজন প্রধান আয়োজক অরূপ মুখার্জির চলে যাওয়া রাস্তায় পা বাড়ালো উৎসবের এক দারুণ উৎসাহি শ্রোতা-দর্শক-সমালোচক-দীপঙ্কর ওরফে রাজা। গণমানসে বিচ্ছেদ শোক চিরস্থায়ী কেন, দীর্ঘস্থায়ীই হয় না। কাছের লোকজনের কাছে সে অভাব নিঃশব্দে যাপিত হয়। কিন্তু গৌরের অপঘাত মৃত্যু-অকালে চলে যাওয়া, ব্যক্তি শোকের বাইরে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেছে। শহর সংস্কৃতিতে বাউল ফকির গান, শহুরে মানুষজন, ভক্তবৃন্দ আর বাউল ফকিরদের জীবন যাপন, পারস্পরিক মেলামেশা, ঘাত-প্রতিঘাত, বাণিজ্যিকরণ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি, পরিবর্তিত গ্রামীণ সমাজ-সময়, এই সব নানান মিশেলে ঠিক কী হচ্ছে বা হতে চলেছে তা বেশ ধোঁয়াটে। শুধুই গৌরের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব, খ্যাপামি, অনন্যসাধারণ জীবন যাপন, নেশা, ভাং, সর্বোপরি গানের মহিমা কীর্তনের প্রয়াস নয়, গৌর খ্যাপার কাছের মানুষদের এবারের লেখালেখিতে উঠে এসেছে সেই সব প্রশ্নই। রুচির যোশী পাঠিয়েছেন তাঁর অ্যালবাম থেকে গৌরের তরুণ বয়সের কিছু কালোসাদা ছবি। হিরণ মিত্রের শিল্পীমন স্মৃতি চারণার পাশাপাশি এঁকেছেন গৌরকে নিয়ে কয়েকটি ছবি। একদা গৌর সঙ্গী পবন দাস বাউল এবং মিমলু

সেনের সঙ্গে কথোপকথনে ধরা পড়েছে গৌর বিষয়ক চিন্তা ভাবনা। স্থানাভাব এবং সময়াভাবে যা অবিকৃতভাবে উপস্থিত করতে না পারায় আমরা ওঁদের দুজনের পাশাপাশি পাঠকদের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী। দীর্ঘদিনের গৌর সখা ল্যাডলী লিখেছেন তাঁর চোখে গৌর বৃত্তান্ত। প্রশান্ত বাবু ও সৌম্যদা তাঁদের বয়ানে গৌরকে অল্প কথায় উপস্থিত করেছেন অন্য মাত্রায়। মহাদেব শী এবং সাগর সাহা পাঠিয়েছেন গৌরের ওপর তথ্যচিত্র - কোলাজ সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য। এক কথায় গৌর যেন তার অনস্তিত্ব দিয়েও এবারের উৎসবে তার রাজ কায়েম রেখেছে। লীনা চাকী তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ভালোবাসা থেকে আমাদের অনুরোধে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুবল গোঁসাইকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মর্মস্পর্শী লেখা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে সুবল গোঁসাইয়ের একটি অনবদ্য স্কেচ দিয়ে অমূল্য সাহায্য করেছেন শিল্পী সৌরজিৎ রায়। এঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তবে একটি লেখার কথা একটু আলাদা করে বলা দরকার। সুকান্তর লেখা। প্রতিবছর উৎসব চলাকালীন আমাদের কানে গান পৌঁছে দেবার এবং পরবর্তী সময়ে সিডিতে শোনার সুযোগ করে দেওয়ার মূল কারিগর সুকান্ত। শব্দ ঘিরে চিন্তাভাবনা আর বাউল-ফকির গানে ওর উৎসাহ-ভালোলাগা এবং জ্ঞান সকলের অগোচরে নিঃশব্দে কাজ করে চলে বলেই আমরা অজান্তে কত কিছু যে পাই এক কথায় বলে বোঝানো যাবে না। ওর কাছে 'আরশিনগর' এর দাবি ছিল খানিক অন্য রকম। কিছুটা শারীরিক কারণে, কিছুটা পেশাদারি কাজের কারণে বেচারি নাজেহাল অবস্থার মধ্যেও যে শব্দানুভূতির কথা পেশ করেছে তার ভৌগলিক পরিসরেই বাউল-ফকির উৎসবের ঘাঁটি। আপাতঃ দৃষ্টিতে কিছুটা খাপছাড়া হলেও ধ্বনি-শব্দ, গানের পদ - সুরের রেশ যে একটু অন্য ভাবে মাথার মধ্যে স্থান করে নিতে পারে তার আভাস

আছে এই লেখায়।

প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের যা অবস্থা, আমন্ত্রিত বাউল ফকিররা এবারে সে কারণে এসে উঠতে পারলেন না। আর্থিক কারণে সম্ভব হলো না রাজস্থান-পাঞ্জাব থেকে সুফী গায়ক গায়িকাদের আমন্ত্রণ করার। চেষ্টা করা হয়েছে কিছু প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের এই উৎসবে আনার যাঁরা আগে আসেননি। চেষ্টা জারি থাকবে মঞ্চে শিল্পী সমাগমের বাহুল্য কমিয়ে গুণী গায়কের বেশি গান শোনার।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকেই যাবে, তাড়াহুড়ো করার খেসারত। পাঠক তা নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয়ই। উৎসবে তথা আরশিনগরের পড়শি পৃষ্ঠপোষকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ আরও একবার আমাদের উৎসব পালনে প্ররোচিত করায়।

অরূপ দাস

ছবি : হিরণ মিত্র

...একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খেতে দিলে তবেই না গ্রহণ ও দান এক হয়ে উঠতে পারে। খাওয়াকে তাই সেবা করা বলে। গর্ভধারিণী মা ও গর্ভস্থ শিশু একসঙ্গেই খায়। সব মানুষই আমাদের মা। আমরাও তাদের মা। পুরুষেরও মাতৃত্ব থাকা চাই। মাতৃত্ব থাকলে ধারণ করা যায়। আমরা ভুলে যাই আমরা সবাই মহামায়ার সন্তান। তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই তাঁর মাতৃত্ব দিয়েছেন। আপনি আরেকজনের ক্ষুধা-কষ্টে কাঁদবেন কী করে, যদি না তাকে গর্ভের ধারণ করতে পারেন। অর্থাৎ যদি-না তাকে একেবারে আপনার ভেতরে নিতে পারেন।...

গৌরের উক্তি, 'দাহপত্র' প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত দীপক মজুমদারের লেখা 'মন-গোয়ালা তারাপীঠ গৌর গার্জিনিৎসে'-র অংশ থেকে উদ্ধৃত।

বানান অপরিবর্তিত

ত্রিভুজের এক বাহু

হিরণ মিত্র

গৌর একটা বিস্ফোরণ। সাধারণ ভাবে, আউল বাউল নিয়ে একটা শহুরে আবেগ মেলা, অনুষ্ঠান, নানা চত্বরে ছড়িয়ে থাকে। গান, মাদকতা, নেশা, দর্শন, ধর্ম সব মিলিয়ে একতাল বিস্ময়। এখানে গৌর বেমানান, প্রচুর কথা বলে নানা খ্যাপামিতে তাল কাটে, ঝগড়া হয়, কখনও শারীরিক নির্যাতন, আপাত ছন্দহারা মনে হলেও ভিতরে ভিতরে অপূর্ব এক জীবনবোধ, অপূর্ব এক ছন্দ তাল আমাদের বেঁধে রাখত। এটা বোঝানো মুশকিল। আমি যে ভীষণ বাউল সঙ্গ করেছি, মেলায় মেলায় অনেক রাত কাটিয়েছি এমন নয়। অবশ্যই একটা বয়সে এমন ঘটনা ঘটেছে। তারই মধ্যে আমি আমার ছন্দ খুঁজেছি। এরা আমার সহযোগী। আমার বৃত্তে ওরাও যেমন ঢুকেছে, আমিও সামান্য ওদের বৃত্তে ঢুকেছি। ওরা আমায় ঢুকতে অনুমতি দিয়েছে। এই স্থান মাহাত্ম্য আমার কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল। আমি অযাচিত অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করি না। অবশ্য এই বিশ্বাস অ-বিশ্বাস তেমন জরুরিও নয় অনেকের কাছে। কিন্তু আমি এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নিজস্ব বৃত্তকে শ্রদ্ধা নিয়ে দেখেছি। আমার চিত্র-ভাস্কর্য চর্চায় এটা একটা প্রধান অনুষঙ্গ। কত ছবি আঁকলাম। কত ভাস্কর্য গড়লাম। তার থেকেও তার সাথে মিশে যাওয়া আমার কাছে প্রধান হত। গৌর সে ক্ষেত্রে এক প্রধান পরিচালক। এমন নয় যে কঙ্কের টান আমাকে গৌর শিখিয়েছে অথবা ওর হাতে তামুক সেবনে আমার আনন্দ, এই এনার্জি, এই বিচ্ছুরণ ওই ছটা আমাকে ছবি দেখাত। সেই সাতের দশক থেকে ওর সাথে মাঠে-ঘাটে, খেতে-জঙ্গলে দৌড়ে বেড়িয়েছি। খ্যাপা তখনও খ্যাপা। তথাকথিত বাউল-যাপন এর যে রূপ আমরা দেখতে চাই,

দেখে মজে যাই, তার সাথে মিলত না গৌরের যাপন। ও কাউকে ভয় দেখাতে বা থ্রেট করতে চায়নি। কিন্তু ও ছিল মূর্তিমান থ্রেট। ওর কোনও আখড়া ছিল না বাউল মেলায়। ঘুরে বেড়াত, প্রচণ্ড ঠান্ডায় আলের ধারে শুয়ে পড়ত। ধুলোময়লা শরীর, মাথায় দীর্ঘ চুলের চুড়ো, পেটানো শরীর, কখনও বিনোদনের ভাণ্ডার হয়ে উঠতে চায়নি। ওর প্রথম সাধন সঙ্গিনী হরি আমার কাছে ছোট বোন। নম্র, বিনয়ী, অপূর্ব এক অনুভূতি। অজস্র বেড়াল পরিবৃত সাক্ষাৎ ষষ্ঠী ঠাকুরণ। গৌরকে ভালো সামলাত। ঠিক এমন ভাবে বললে বোঝা যাবে না, ওকে এক রকম বুঝত। ঘাত-প্রতিঘাত শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ওকে গৌরের পাশে থাকার সুযোগ দিয়েছে। একটা সময়ে সেটা ভেঙে যায়। মৃত্যুটা রহস্য। এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কথন আমি এখন আর প্রকাশ করতে চাই না, বিতর্ক চাই না।

ক্যাথরিন ছিল রাশিয়ার মহামান্য জারের নাতনি। এটা আবিষ্কার হয় আমার বাড়ির প্রাতঃরাশের আসরে। আবিষ্কার করি, রাজা দীনদয়ালের আলোকচিত্রে ওর দাদু বা ঠাকুরদা বাঘ শিকার করে গর্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন। যাই হোক এই ক্যাথরিন দীর্ঘ দিন গৌরে মজে ওঠে। দীর্ঘকাল আর্থিক সাহায্যও পাঠায়।

তেমনি খালেদ এসেছিল খমক শিখতে। বহু শারীরিক নির্যাতন সইতে হয়েছে। বহু ব্যয়ে জর্জরিত, প্রায় নিঃস্ব হয়ে ওকে পালাতে হয়, গৌর সমালোচিত হল। এগুলো পার্শ্ব বিষয়। গৌরের নিজের একটা তাল আছে, সে তাল বোঝা বিষয় দায়। তবু বিশ্ব চরাচরের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বানিয়ে তোলায় ওর কোনও জুড়ি নেই। গৌর আমার রক্ষকও ছিল। কোনও মেলায় গৌর থাকলে আমি নির্ভয়ে থাকতাম। একবারই গৌর ছিল না। আমি সর্বস্বান্ত হয়ে, টাকা-পয়সা, ক্যামেরা সব হারিয়ে প্রায় বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে অগ্রদীপ থেকে ফিরে আসি। দুঃখ ছিল,

বহু আঁকা ছবি চুরি যায়। সেগুলো ওরা যারা নিয়েছিল নিশ্চয়ই মাঠের ধারে ফেলে দিয়েছিল। ওদের লক্ষ্য ছিল ক্যামেরা আর টাকা। ছিলাম এক বাউল ভক্তের ঘরে। কারা নিয়েছিল জানতাম। কিন্তু বেশি দূর এগোনো যায়নি।

আমার চিত্র রচনার মূল বা অন্যতম উপাদান গৌর। আসলে যে নিশ্চিত, পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক বর্ণনা বা বিস্তারের ছবি এখানে আঁকা হয়, সেই চর্চাই দীর্ঘকাল বাংলা কলমে আঁকা হয়েছে। সবাই এঁকে চলেছে। "আমিই আঁকছি আমিই নিয়ন্ত্রক", এখানে আমার বিচ্যুতি ঘটল, এরা ঘটাল। আমি যেমন আঁকি, ছবি আমায় আঁকতে লাগল। এটা শিল্পীদের মেনে নেওয়া কঠিন। আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম এমন সঙ্গে, এমন যাপনে। বাইরের অন্যের প্ররোচনায় আমি নতুন বৃত্ত তৈরি করতে গেলাম। ভুল হল, বৃত্ত ভেঙে গেল। আমি নিরাশ হলাম না। গৌর ছিল এই ভাবনার দ্যোতক। ওর খ্যাপামি দিয়ে আমাকে সচল রেখেছিল। এমন গাঢ় বন্ধুত্ব কখনও প্রশ্ন তোলেনি।

এত সব মুরতি দেখিয়েছে, এত ভঙ্গিমায় ভরিয়ে দিয়েছে আমায়। ছন্দ নির্মাণে, বিচিত্র সুরে বেঁধে দিয়েছে আমার তুলি। এই তুলির, এই শিল্প পরিসরে কোনও স্বীকৃতি মেলে না। এটাই স্বাভাবিক। যেমন ভাবে বাউল একটা বিস্ময়, সমাজের চৌহদ্দিতে তার স্থান হয় না, প্রান্ত দেশে পড়ে থাকে, তেমনি আমার তুলির চলন আমাকে এই তথাকথিত শিল্প পরিসরে ব্রাত্য করে রেখেছে। সে ব্যাপারে আমার কোনও ক্ষোভ নেই, স্বস্তি আছে। গৌর ছিল মূর্তিমান অস্বস্তি বিদগ্ধজনেদের কাছে। শহুরে বুদ্ধিজীবিদের কাছে ওর উপস্থিতি অস্বস্তি বাড়াত। নানা বিতর্ক তৈরি হত। ওর জীবন ভাবনা মেনে নেওয়া কঠিন ছিল।

গান গান করে সবাই উৎসুক হয়ে উঠছে, অধৈর্য হচ্ছে, ও কথার বাঁধ

ভেঙে দিচ্ছে। শ্রোতাকে, শ্রবণ, দর্শনে, অভিমুখ নির্ধারণ করতে চাইছে। মনকে বাঁধার চেষ্টায়। গতানুগতিক বাউল ফকিরদের পোষাক, ব্যবহার, আচার আচরণ কোনোটাই ওকে স্পর্শ করেনি, বাউল বিশেষজ্ঞরা ওকে তাই তাদের চর্চার বাইরে রেখেছেন। বইতে নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। এতেই এর অবস্থানের যৌক্তিকতা আরও দৃঢ় হয়। যত সেটা দৃঢ় হয় ততই এই তথাকথিতের দল শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ওকে আঘাত করে কুৎসা করতে সচেষ্ট হয়। এটাই স্বাভাবিক।

গৌরের ঘরে আমি, আমার ঘরে গৌর—বহুকাল কেটেছে। নানা জায়গায় ও ঘর গড়েছে। তা ভেঙেছে, বিতাড়িতও হয়েছে। সে কাহিনি দীর্ঘ।

ঘর ভাঙার কথা বলেছি, বোলপুর থেকে নির্যাতিত হয়ে বিতাড়িত, মতিহারী থেকে বিতাড়িত, নিজের যত্নে যেটা বানাচ্ছে, তাকে ত্যাগ করে যেতে একটুও প্রাণ কাঁদছে না।

ও অন্যদের নিয়ে খেলতে ভালবাসত। নিজে খেলতেও চাইত। কিন্তু ওর কথা শুনতে হবে, ভাবনা শুনতে হবে, দর্শন শুনতে হবে। সংযোগ ঘটিয়ে তোলা, সংযোগের নতুন অর্থ তৈরি করা, সংযোগের সংযোগ ঘটানো—এমন অপরিচিত কথার চল আমাদের সমাজে নেই।

আমার কাছে গৌর-দীপক-গৌতম এক ত্রিভুজ। তিনজনের সংযোগের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। দীপকদা যেমন সামগ্রিক বা হোলিস্টিক বিষয়কে নিজে আবিষ্কার করতে চাইতেন, তার সঙ্গে সহযোগী খুঁজছেন। প্ররোচিত হতে হয়। এই প্ররোচনা ঠিক কখন কী ভাবে আসছে তার কোনও পূর্ব পরিকল্পনা থাকবে না। দীপকদা আমার বইয়ের তাকের সামনে দুটো পা ফাঁক করে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালেন। জোরে একটা তালি দিলেন। এই তালির শব্দটা তার নিজের জন্যই। সবাইকে

চমকে দিতে। সচকিত হলেন। অনেকটা নাট্য ভঙ্গিমার মতো। এবার অন্ধের মতো সামনে একটা বই হাতে তুলে নিলেন। হঠাৎ করে বইটা খুললেন। যে পাতাটা বেরল, সে পাতার যে অক্ষর বা শব্দে তার চোখ আটকে গেল, সেইটাই সেদিনের সারাদিনের কাজের শুরুয়াত করে দিল। এই রকম প্ররোচনা অহরহ ঘটত। রাস্তায়-ঘাটে, নেশার আসরে, তর্কের খাতিরে শব্দ উঠে আসত। শব্দ আমাদের তাড়া করত। আমরাও শব্দকে তাড়া করতাম। সেটাই বিষয় হত। গৌতম সুরে বাঁধা অস্তিত্ব। গৌতমের হাঁটা-চলা, দাড়ি মুচড়নো, কাঁধ দোলানো, সেই থেকে গিটার হাতে তুলে নেওয়া, গিটারে সুর তোলা, তারপর হঠাৎ গেয়ে ওঠা। সুর আগে কি কথা আগে, আমাদের গুলিয়ে যেত। কথা এবং সুরের এমন যুগলবন্দিতে আমি মেতে উঠতাম। যখন ওর সাথে গানের অনুষ্ঠানে ছবি এঁকেছি তেমন কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই অর্থাৎ ওর সুরটাই ছবি। কথায় হয়তো ঘটনার বা ছবির আভাস আছে, আমি সেই কথাকে পার হয়ে চলে যেতে চাইতাম, এমন সব ঘটত এমন সব রং তুলিতে উঠে আসতো, এমন সব আকার রেখা ক্যানভাসময় নৃত্য করত আমরা সবাই তাতে মেতে উঠতাম। ভাল না মন্দ এসব বিচার বিবেচনা দূরে সরিয়ে রেখে একটা যৌথতা-সুর-তাল-ছন্দ-লয়-রং আমাদের সময়টাকে ফিরে ফিরে দেখাত। দৃষ্টি নয়, শুধু অংশ নেওয়া, অংশ হয়ে যাওয়া, শরীর ও মনে, যেমন নতুন কাজ করলেই গৌতম আমার স্টুডিওতে হানা দিত তেমনই নতুন গান বাঁধলে আমি ওর ডেরায়। চলে যাওয়ার আগে জোর করেই সে আমার কাছে সারাদিন কাটায়। রাত পর্যন্ত অজস্র গানে কথায় নেশায় যেন আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাল।

গৌর এসব কিছুই করেনি। বুদ্ধি দিয়ে গান, বুদ্ধি দিয়ে প্ররোচনা, এসবের বাইরে গৌর ছিল একটা আবেগ হয়ে। গৌর তাই ভাবুক। এই ভাবুকপনা — আমি স্থির বসে থাকি, আকাশ পাতাল ভাবি, খুঁজে বেড়াই, বৃত্তের পরে বৃত্ত রচনা করি, গৌর এমনই একটি বৃত্তের একটি

রেখা। যে সচল, ঘূর্ণায়মান এবং যে অস্থির। আমি এই অস্থিরের খোঁজেই থাকতাম। অস্থির আমাকে অস্থির করত। আমি গৌরের সহযোগী না গৌর আমার সহযোগী এটা অমীমাংসিতই থাক। কিন্তু গৌরের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়িয়ে আমি এক গৌর নির্মাণ করতাম। যে নির্মাণ এখনও চলছে।

দীপক যেখানে প্ররোচনা, গৌতম সেখানে সুর, গৌর সেখানে ভাবনা।

ব্রাত্যজনের ভাষা নয়, ব্রাত্যজনের অস্তিত্ব নির্মাণ, নতুন সুরে তার বেঁধে নেওয়া–তাই ছিল মূল বিষয়। এখন আমরা সেই বিষয় থেকে দূরে চলে গেলাম। গৌরের চলে যাওয়া, অনেক ভাবনার আপাত মৃত্যু। আমি তিনজন বিশেষ সহযোগীকে হারালাম, যারা আমার তিন দিক আগলে রেখেছিল। প্রথমে গেলেন কবি দীপক মজুমদার, তারপর গাইয়ে গৌতম চট্টোপাধ্যায়, তারপর ভাবুক গৌর খ্যাপা। এই তিনজন আবার এক ত্রিকোণ, যে ত্রিভুজের বাহুগুলো সমান। এদের পারস্পরিক সংযোগও ছিল দেখার মতো।

যে ত্রিভুজে গৌতম, গৌর থেকেছে তারা কোনও মায়ায় নিজেদের জড়ায়নি। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে চতুর্থ যে দেখছে, শুনছে, আঁকছে। এ এক বিচিত্র অবস্থান। তাই হতে হতে আমি অনিশ্চিত। অজানা রয়ে গেলাম। যে যাপন আমাকে নির্মাণ করেছে, সেই যাপন অজ্ঞাত রয়ে গেল সেই সব দর্শক, শিল্পী, জনসমালোচক এই ভাষাকে বিচিত্র, বালখিল্য, অপটু হাতের চিত্রকর্ম ভাবতে লাগলো। কেউ মন্তব্য করলেন এতে শিরদাঁড়ার অভাব। কেউ বললেন অগভীর। কেউ বলল দেখলেই ফুরিয়ে যায়। ব্যঙ্গ হলো 'দু'মিনিটের ম্যাগি' বলে, দ্রুত তুলির আঁচড় চলেছে। রঙ পরতে পরতে সুরের আরোপে .... হচ্ছে, এতে অস্বস্তি থাকাই স্বাভাবিক।

আশির শুরুতে দীপকদা তিনজন বাউল নিয়ে ইউরোপ যান। সুবল দাস, গৌর খ্যাপা, পবন দাস। গৌর পরে গ্রোটভস্কির কর্মশালাতে যোগ দেয়। যেখানে অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ ছিলেন ও গৌরকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেন। মান্যতা দেন। দীপকদা 'চিত্রবাণী'-র পক্ষে বাউল অনুধাবনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পেয়ে গেলেন গৌরকে। অনেক বিতণ্ডা হয়, বিতর্কও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংযোগ হারায় না। দীপক, গৌতমের মৃত্যুতে হাহাকার করে ওঠে গৌর। গৌরের জন্য কে রইল!

ছবি : হিরণ মিত্র

খ্যাপার মন

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

সে ছিল এক গ্রীষ্মকাতর সন্ধ্যা। গিয়েছি সোনামুখীর মেলায়। এখানেই আমার সাথে প্রথম দেখা গৌর খ্যাপার। একটা ভাঙা আসরে, বেশ কিছু গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে বসে গৌর ভরপুর গাঁজার ছিলামে টান মারছে। তাম্রি মারা বর্ণময় এক আলখাল্লা পরা আঠাশ-উনত্রিশ বছরের সুদর্শন গৌর। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল আর বুদ্ধিদীপ্ত-তীক্ষ্ণ চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। ভাবসাবখানা যেন একজন জ্যাজ মিউজিশিয়ানের মতো। আর একটু নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মুখাবয়বটি যেন রাস্তাফেরিয়ান গায়ক বব মার্লের আদলে বসানো। আমি সত্যিই অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমার জীবনকে যথেচ্ছ যাপন করার ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত (অল্টারনেটিভ) এবং প্রান্তিক জীবনধারা, যাকে ইংরেজিতে বলে সাব-মার্জিনাল লাইফস্টাইল তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম—সে ক্ষেত্রে আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন যথাক্রমে কবি দীপক মজুমদার ও সংগীতজ্ঞ-চলচ্চিত্রকার গৌতম চট্টোপাধ্যায় (মণিদা)। এঁদের কাছ থেকেই আমি প্রথম শুনি গৌরবৃত্তান্ত। গৌরের দীপকদা সম্পর্কে ছিল অসম্ভব শ্রদ্ধা আর মণিদা ছিল গৌরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রথম দেখাতেই আমি যখন নিজের পরিচয় জানাতে বলি যে আমি গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু ও সহকারী তৎক্ষণাৎ গৌর আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলে, 'যে গৌতমদার বন্ধু, সে আমারও বন্ধু।' সেই বন্ধুতা আমৃত্যু আমাকে গৌরের সঙ্গে রেখেছে বিগত তিন

তিনটে দশক ধরে। হয়ত বা তার থেকে বেশিই হবে। আজ আর ঠিক মনে নেই।

গৌরের জন্ম বীরভূমের ভালকুঠি গ্রামে। বাবা মাধব খ্যাপার কাছেই গৌরের সঙ্গীত শিক্ষার শুরু। পিতৃমাতৃহারা গৌর খ্যাপা খুব কম বয়স থেকে গান গাইতে শুরু করে। ওর কথায়, 'আমার ঠিক মনে নেই যে কবে আমি গান গাইতে পারতাম না।' একবার এক আসরে কেউ খ্যাপাকে বলে, 'একতারা নেই, তার আবার বাউল গান', তো এই কথা শুনে গৌর একটা নারকোল তেলের কৌটো দিয়ে একতারা তৈরি করে নেয়। এটাই ছিল তার প্রথম বাদ্যযন্ত্র। চিন্তামণি দাসী ছিলেন মারাত্মক দক্ষ বাউল গায়িকা। তিনি থাকতেন বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে। এই গ্রাম পূর্ণদাস বাউলেরও জন্মস্থান। তা সেই চিন্তামণি মা বারো বছর বয়সের গৌরকে আবিষ্কার করেন এক মেলায়। নিয়ে আসেন তাঁর গ্রামে, শুরু হয় তালিম। গৌর সেখানে কিছুদিন থাকে। তারপর যা হয়, খ্যাপার মন বৃন্দাবন। আবার সে বেরিয়ে পড়ে। তার সাথে এক রাসমেলায় দেখা হয়ে যায় নদিয়ার প্রখ্যাত বাউল সুবল দাসের সঙ্গে। সে সময় গৌর চটের বস্তা গায়ে ঘুরে বেড়াত। মাথা ভর্তি উকুন, গায়ে পোকার-বাসা বেঁধেছে; নবীন কিশোর গৌর তা বোঝেনি। ফলে চুলকিয়ে সারা শরীরে ঘা করে ফেলেছে। এই সব দেখে সুবল দাস বাউল এই চমৎকার কণ্ঠের অধিকারী গৌরকে তাঁর আড়ংঘাটার আশ্রমে নিয়ে যান। সেখানে গৌর বহুদিন থাকে। বলা যায় সুবলের কাছেই গৌরের গানের প্রকৃত শিক্ষা। সুবল দাসকে গুরুবোধে শেষ দিন পর্যন্ত গৌর 'বাবা' বলেই সম্বোধন করেছে। সুবল দাসই তাকে নিয়ে যায় বাঁকুড়া জেলার নবাসন গ্রামের হরিপদ গোস্বামীর কাছে। হরি গোঁসাই দীক্ষা দেন সহজিয়া বাউল মতে। এই শেষ যোগী-সাধক হরি গোঁসাই আমাকে বলেছেন যে, 'গৌর যত যোগাসন জানে, তন্ত্রমন্ত্র জানে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধনা জানে—তা আজ বাউল

সমাজে সত্যিই বিরল।'

গৌরের সাথে পরিচয় ছিল শান্তিনিকেতন ও কলকাতার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি সমাজের। ঋত্বিক ঘটক, শান্তিদেব ঘোষ, রামকিঙ্কর বেইজ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন ও একইরকম আরও ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেয়েছিল গৌর। দীপকদা গৌরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় নাট্যঋষি জের্সি গ্রোটভস্কির। সেই সূত্রে গৌর যোগ দেয় পোল্যান্ডে গ্রোটকৃত থিয়েটার অফ সোর্স-এর কর্মশালায়। সেখানে তার পরিচয় হয় অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ ও রেখা সাবমিজের সঙ্গে। নাসিরের কাছে শুনেছি যে সে কীভাবে গৌর খ্যাপার গান শুনে, কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিল। প্রায় গোটা ইউরোপেরই বিভিন্ন দেশে খ্যাপা নানা সময় গেছে। গেছে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে। একবার পিটার ব্রুক এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তখন তিনি 'মহাভারত' নির্মাণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল দীপকদার সাথে পিটার ব্রুককে গৌর খ্যাপার নিচুরাঁধগোড়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার। ব্রুক গৌরকে 'মহাভারত'-এ গান ও অভিনয় করার প্রস্তাব দেন। টাকা-পয়সা ঠিক হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত গৌর বায়না ধরে যে তাকে রোজ অন্তত এক ভরি গাঁজা দিতে হবে। ব্রুক জানায় যে গৌর যত ওয়াইন বা লিকার খেতে চাইবে তা তাকে দেওয়া হবে কিন্তু গাঁজা দেওয়া যাবে না। গৌর গোঁ ধরে বসে থাকে। ফলে গৌরকে দিয়ে প্রখ্যাত এই নাট্য পরিচালক 'মহাভারত'-এ কাজ করাতে পারেননি।

গৌর সুন্দর, গৌর সহজ, গৌর খ্যাপা। তবে তার ব্যবহার ঘোর অনিশ্চিত। কখন কী করবে তা বুঝে ওঠা সত্যিই দুষ্কর। সে ছিল প্রকৃত প্রতিষ্ঠান বিরোধী। পরিবেশ নিয়ে ছিল তার অসম্ভব সচেতনতা। কোথায় চাষাবাদে কেমিকেল দেওয়া হচ্ছে, কোথায় শব্দদূষণ হচ্ছে, কোথায় কোন শহরে গাড়ির ধোঁয়ায় মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

সমস্ত বিষয়েই ছিল তার সতর্ক মন্তব্য। যেভাবে ওর কথায় সব সময় উঠে আসত 'অরিজিনাল আর ইমিটেশন', 'প্ল্যাস্টিক আর সোনা', 'বাউল আর ফাউল'। অসম্ভব রসিক ছিল গৌর। রাজনীতি থেকে সমাজতত্ত্ব নিয়ে নিজের মতো করে অনর্গল কথা বলতে পারত। সে সব কথার আপাত বাস্তব কোনও মানে-ব্যাখা নাও থাকতে পারে। তথাপি যারা শুনছে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত গৌর। মনে আছে একবার কলকাতায় খবর এল, ওর প্রথম খেপি হরি দাসী আত্মহত্যা করেছে এবং গৌরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুনে আমরা দৌড়ালাম। পৌঁছে দেখি থানার উল্টো দিকে একটা চায়ের দোকানে বসে গৌর গাঁজা খাচ্ছে, কথা বলছে আর গান গাইছে। পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবলরা সেখানে শ্রোতা।

গৌর কলকাতায় এলে রাতের কলকাতায় গাড়ি চড়তে পছন্দ করত, বিশেষ করে আমি চালালে। আমার গাড়ি চালানো সম্পর্কে ওর বক্তব্য ছিল, 'ল্যাডলী দারুণ গাড়ি চালায়। রাস্তা নেই, ঘাট নেই। আর ল্যাডলীর গাড়ি হু হু করে চলছে।' এমন সব অজস্র ননসেন্স কথা বলত। আবার লিখছি, তার হয়তো কোনও মানে-মাত্রা নেই। কিন্তু শুনতে মজা লাগে। ওর রাতের বেলার প্রিয় স্থান ছিল কেওড়াতলার শ্মশান। ও বলত, 'তুমি তো আমার আগে মরবে। তুমি তো শালা হিন্দু! এই শ্মশানেই তোমাকে দাহ করা হবে। কোনও ইলেকট্রিক চুল্লি নয়। কাঠে পোড়ানো হবে। তারপর সেই ছাই নিয়ে কলকাতার বাবুদের গায়ে আমি মাখিয়ে দেব। তবে আমার সমাধি হবে কঙ্কালীতলায়। আমার মা-বাপের সমাধির কাছে। তখন তো তুমি থাকবে না দেখি, একটা ব্যবস্থা কিছু করে দিতে হবে।' তখন ভাবতেও পারিনি যে সত্যিই আমি থাকব আর ও থাকবে না। আমাকেই করতে হবে ওর সমাধির যাবতীয় ব্যবস্থা।

ওর সাথে দীর্ঘ দিন কাজ করেছি এমনি সময় কাটানো, গান শোনা আর ঘুরে বেড়ানো ছাড়াও। গত বারো-তেরো বছর ধরে তোলা প্রায় তিনশো ঘণ্টার ওপর রাশ থেকে একটা ছবি বানানোর প্রয়াস নিয়েছি। তা আজ প্রায় শেষ পথে-সেন্সর করানোর পথে। ছবিটা অন্যভাবে শেষ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা করা গেল না। একই ভাবে সুবলদাকে নিয়ে যে ছবি করেছি তা-ও আমার মনঃপূত হয়নি। এই ভাবেই হয়তো অধিকাংশ নির্মাণই অসমাপ্ত থেকে যায়। একটু ঘুরিয়েও বলা যায় অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করার আরাধনায় এই সব যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা, নির্মাণের খণ্ড বৈচিত্র।

গত বছর কেঁদুলির মেলায় শেষ বারের মতো দেখা হল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বইটার খবর কী?' বললাম, 'হয়ে এসেছে। এবার বইমেলায় প্রকাশ পাবে।' গৌর জানতে চায়, দাম কত হবে বইটার? বললাম, 'ছয়শো টাকা দাম হচ্ছে। চিন্তা হচ্ছে আমার বই এত দাম দিয়ে কে কিনবে, পড়বে।' গৌরের প্রশ্ন, 'ওতে আমার সম্পর্কে লিখেছ? ছবি আছে?' বললাম, 'নিশ্চয়ই! প্রচ্ছদেই তোমার চাঁদপানা মুখ ছাপা হয়েছে। প্রকাশের দিন থেকো। আগে থেকে জানাব। সে সব কথা শুনল কী শুনল না, গৌর বলল, 'আমি যখন আছি তাহলে বইয়ের দাম হাজার টাকা করতে বল।'

ভাবতেই পারিনি যে সজ্ঞানে এটাই আমার শেষ দেখা।

জয় গুরু...

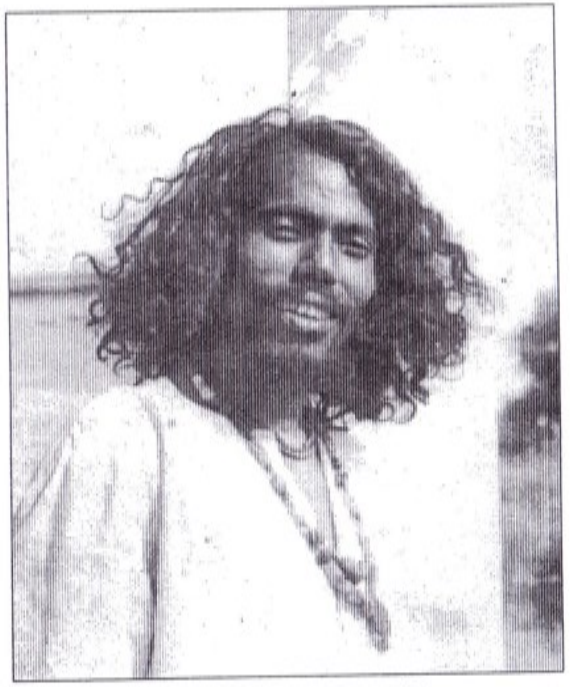

ছবি প্রশান্তচন্দ্র রায়

স্মৃতির আলোকে গৌর খ্যাপা

প্রশান্ত চন্দ্র রায়

সমাজতত্ত্ববিদ প্রয়াত বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "জনসমাজের মধ্যে সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়েও প্রত্যেক মানুষ চায় বিশেষ কোন মুহূর্তে নির্জনতায় ডুবে যেতে। বাউলের একতারা, পোশাক, বাউলের নৃত্যভঙ্গী, সুর, গানের ভাষা, মুখ-হাত-পায়ের-চোখের ভঙ্গিমা — সমস্ত মিলিয়ে যে পরিমণ্ডল রচিত হয়, তা বাস্তবিকই মানুষকে অসাড় করে দেয় আত্মমগ্ন নির্জনতার মধ্যে।"

প্রয়াত গৌর খ্যাপার গান শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে — তাঁরা অবশ্যই মর্মে মর্মে সেটি অনুভব করেছেন। দীর্ঘ দিনের বাউলের সঙ্গ করে এবং বিভিন্ন মেলা মোচ্ছবে অংশ নিয়ে কখন যে নিজের অজান্তে আমি তাদের একজন হয়ে পড়েছি বুঝতে আজও অক্ষম। গৌর খ্যাপা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার বাউলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অনেক সংগ্রামও তাকে করতে হয়েছে অতি অল্প বয়স থেকেই।

এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গৌর খ্যাপার প্রাণপাখি খাঁচা ভেঙে হঠাৎ পালিয়ে গেছে অচিনদেশে। যে মানুষটি প্রতিদিন তার গানে, প্রকাশ মুদ্রার মাধ্যমে হাজার মানুষের মনে তাদের অজান্তে আশ্রয় করে নিতে চেষ্টা করেছিল মৃত্যুর কদিন আগেও। গত বছর ২৮ জানুয়ারি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় জানতে পারি গৌর খ্যাপা আর নেই। যদিও ২৪শে জানুয়ারির আনন্দবাজারে প্রকাশ হয় পথ দুর্ঘটনায় গৌর খ্যাপার গুরুতরভাবে আহত হওয়ার এবং ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালক এবং গাড়ির মালিক এক মহিলা সহযাত্রীর মৃত্যুর খবর। জয়দেব কেন্দুলি থেকে বোলপুর ফেরার পথে ইলামবাজার পার হয়ে চৌ

পাহাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের গাড়িটি পথের পাশে পর পর দুটি শালগাছে ধাক্কা মেরেছিল। গৌর প্রথমে বোলপুরের কাছে শিয়ান হাসপাতাল এবং পরে বর্ধমান হাসপাতাল হয়ে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এস এস কে এম হাসপাতালে। সরকারি ব্যবস্থায় ভর্তি হয়েছিল কিন্তু তাকে বাঁচানো সম্ভব হল না। আঘাত খুবই গুরুতর ছিল। অকালে অসময়ে ফাঁকি দিয়ে গানের পাখি উড়ে গেল। তার মরদেহ কংকালীতলা মহাশ্মশানে সমাহিত করা হল — এখন সেখানেই সে চিরনিদ্রিত।

গ্রামে, গঞ্জে, শহরে অথবা রেলগাড়িতে আমরা যে সব বাউল গায়কদের দেখতে পাই তাদের সাথে গৌর খ্যাপার তুলনা করলে খুবই ভুল হবে। গৌর নিজেই তার নিজস্ব এক ঘরানা গড়ে তুলেছিল। ওর জীবনচর্চা এবং একই সঙ্গে সাধন ভজনের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা — খুব কাছ থেকে যা দেখার সুযোগ বার বার আমি পেয়েছিলাম — দীর্ঘদিন সঙ্গ করার ফলে।

গৌর খ্যাপার সাথে আমার প্রথম দেখা জয়দেব কেন্দুলি মেলায়। যত দূর মনে পড়ছে, সময়টা ১৯৭৮ এর ১৪ই জানুয়ারি অথবা ১৫ই জানুয়ারি। সাতের দশক থেকেই প্রথম আমি জয়দেব মেলায় যেতে শুরু করি। সে সময় মেলার এত রমরমা ছিল না, গ্রামের মানুষ এবং দূরদূরান্ত থেকে সাধু, বাউল, দরবেশ ও বৈরাগীদের দেখা পাওয়া যেত। বর্তমানে মেলা বাড়তে বাড়তে অজয় নদের বালুচরে পৌঁছে গেছে।

কদমখণ্ডী মহাশ্মশানের ধারে বিশাল বটগাছের তলায় — এক আখড়ায় গৌর খ্যাপা পাগলের মতো গান গাইছিল। তখন সে বলিষ্ঠ এক যুবক, একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল কাঁধ ছাড়িয়ে পড়েছে। মাথা নিচু, খুব দ্রুত তালে তার গুপিযন্ত্র বেজে চলেছে। মুখটা দেখাই যাচ্ছিল না, পরিধানে চটবস্ত্র। একের পর এক দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মনোশিক্ষা ও আরও অনেক মহাজনী পদ গেয়ে চলেছে কিন্তু কোনও ক্লান্তি নেই। তিন সপ্তকে তার গলা উঠছে, নামছে — শ্রোতা ভক্তজন মুগ্ধ হয়ে সে

সব গান শুনছিল। দু'চারজন বিদেশি বিদেশিনীদেরও দেখতে পেলাম—মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে। আমি প্রায় দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সব গান মন দিয়ে শুনে হতবাক হলাম। গান শেষ হলে অন্য আখড়ার দিকে পা বাড়ালাম কিন্তু গৌরের গান ছাপিয়ে অন্য কোনও আখড়ার গান মনে দানা বাঁধতে পারল না। কাছে বসে আলাপ করার সুযোগ পাইনি সে বছর।

পরের বছর আবার যদি দেখা পাই সে আশায় বিভিন্ন আখড়ায় খোঁজ করি। অনেক বাউলকে জিজ্ঞেসও করি যে গৌর খ্যাপা এসেছে কিনা, সঠিক খবর কেউ জানাতে পারেনি। গানের মাধ্যমে বাউল যে মানুষের মনের মাঝে পাকা আসন পেতে বসে এবং রাজত্ব করে, সেকথা গুণীজনের কাছে শুনেছিলাম। তার প্রমাণ পেলাম গৌরের দেখা না পেয়ে। আমি সে বছর চার পাঁচ দিন ছিলাম বিভিন্ন আখড়ায় কিন্তু গৌর খ্যাপার দেখা পেলাম না। বাংলার বিভিন্ন মেলা মোচ্ছবে ঘুরতে ঘুরতেই আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের সাথে আমার দেখা হয়ে যায় সাঁইথিয়ার কাছে ময়ূরাক্ষীর পাড়ে কোটাসুর খ্যাপা মায়ের আশ্রমে। বর্তমান কালে আদিত্য মুখোপাধ্যায় বীরভূমে অতি পরিচিত নাম। সে বাউল গবেষকও। প্রতিবছর ভাদ্র মাসে মোচ্ছব হয় ওই আশ্রমে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ—বাঁকুড়া এবং বীরভূমের নানা প্রান্ত থেকে বাউলরা আসে গান গাইতে, আশ্রমের পক্ষ থেকে তাদের সেবাযত্ন করা হয়। খ্যাপা মায়ের শিষ্য বীরভূম জুড়ে। তাঁকে নিয়ে অনেক কাহিনি আছে। শোনা যায় ষাট বছর বয়সেও তাঁকে দেখাতো আঠারো বছরের যুবতীর মতো। একটি বকুলগাছকে খ্যাপা মা বৈরাগ্য দিয়েছিলেন যে গাছে ফুল হবে কিন্তু ফল হবে না। সে গাছটি আজও বর্তমান।
গৌর খ্যাপার সাথে সেখানে দেখা হল। বাঁকুড়া সোনামুখীর কাছে খয়েরবনী আশ্রমের সাধক বাউল সনাতন দাস, বোলপুরের ভাবসাগর বিশ্বনাথ দাস, পঞ্চানন ঠাকুর (মুখোপাধ্যায়), চিন্তামণিদি'র সাথেও দেখা হল। মুর্শিদাবাদ থেকেও কিছু বাউল বৈষ্ণব এসেছিল।

শান্তিনিকেতন থেকে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ সস্ত্রীক এসেছিলেন এবং রাতভর গান শুনেছিলেন। গৌর খ্যাপা শান্তিদেব ঘোষকে মামা বলে ডাকছিল এবং আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বলছিল। যা হোক, পরিচিত হলাম গৌরের সাথে এবং দিনে দিনে গৌর খ্যাপার সাথে একাত্ম হতে শুরু করলাম। দীর্ঘদিন চাকুরিসূত্রে আমি চিত্তরঞ্জনে ছিলাম। সুন্দর পরিবেশে সুন্দর একটি কোয়ার্টারে স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা সহ থাকতাম। বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গৌর খ্যাপাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে সে অনুরোধ রক্ষা করতে কখনও একাকী আবার কখনও বিশ্বনাথ দাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দ্বিধা করেনি। সম্মান দক্ষিণা নিয়ে কোনও অসন্তোষ ছিল না। মাস বছর ঘুরে ঘুরে আসে। আমিও দিন দিন গৌরের কাছের মানুষ হতে থাকি। তার সাধনসঙ্গিনী হরিদাসী আমাকে দাদা বলে ডাকতে শুরু করে। দাঁইহাটের (বর্ধমান জেলা) মীরাদাসী ছিলেন হরিদাসীর মা। তিনি ভাল কীর্তন গাইতেন। হরিদাসী দীর্ঘদিন গৌর খ্যাপার সঙ্গিনী ছিলেন। গৌরের খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতায় যাতায়াত শুরু হল। একে একে দীপক মজুমদার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, হিরন্ময় মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে গৌর খ্যাপার যোগাযোগ হওয়ার কারণে পৃথিবীর নানা দেশে সে বাউলগান গাইতে যাওয়ার সুযোগ পায়।

জের্সি গোটাভস্কি তাকে পোল্যান্ডে নিয়ে যান। তারপর রাশিয়া, জার্মানি, লন্ডন, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলস, শিকাগো, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, নিউ লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন প্রভৃতি জায়গায় গৌর খ্যাপা বাউলগান গেয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল।

সে সব দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা গৌর আমাকে বার বার জানিয়েছে। অনেক অর্থও উপার্জন করেছিল! কিন্তু আসলে সে ছিল জাত খ্যাপা, সঞ্চয়ের নেশা তার ছিল না। গান গেয়ে দু'হাতে অর্থ উপার্জন করে চার হাতে সে অর্থ শেষ করতে সে দ্বিধা করেনি।

হরিদাসীর মৃত্যুর পর কেমন যেন উদাস ভাব তার মাঝে লক্ষ্য করতাম। মাঝে মাঝে কামাক্ষা চলে যেতো– সেখানে নাকি তন্ত্র মতে সাধনা করত। সেখানেই দ্বিতীয়বার মালা চন্দন অথবা বিয়ে করে গৌর। তার একটি কন্যা সন্তানও হয় শুনেছি তারও বিয়ে হয়েছে। নিচু বাঁধগোড়ায় দ্বিতীয়বার কুটির বানিয়ে আমাকে অনেকবার তার কুটিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সময় সুযোগ পেলে আমি গিয়েছি, গানও শুনেছি বার বার। মোবাইল ফোনে কথাবার্তা হত।

গৌর খ্যাপার গাওয়া অনন্ত গোঁসাই এর পদ

"ওরে আমার মন গোয়ালা
রোজ দুবেলা দুধ যোগাবি
এই কথাটি আঁটা আঁটি খাঁটি দুধ আমায় দিবি"—

অথবা

"মূঢ় মন আমার কথা শোন
এখনও তুই বুঝে চল
গুরু কৃষ্ণ ভুলে কাল কবলে
কেন যাবি চলে রসাতল—"

বিখ্যাত সাধক রাধাশ্যাম দাসের গান

আবার গাইত

"কেন মিছে মরলি জাল ফেলে
ওরে মন জেলে"

গাইত —

"চেনার মানুষ চিনিনা গুরু দাও হে চেনাইয়া—
কে যেন বাজায় গো বাঁশি নির্জনে বসিয়া" —ইত্যাদি

অনেক গান সে আমাকে প্রাণ খুলে গেয়ে শোনাত। আমার রচিত কিছু পদও গৌরখ্যাপা গাইত—

যেমন—"আমার মন ময়রা মিঠাই বানায়—
মিঠাই চেনে না—"

আবার গাইত

"যাবে যদি কৃষ্ণ দরশনে
সহন ধর যতন কর
মিলবে দেখা তার সনে।"
গানের সুর সে নিজেই করত—আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না যে পদগুলি আমার রচিত—এত সুন্দর ভাব সে সব গানে ফুটে উঠত।

গৌর খ্যাপা নিজে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি কিন্তু শত শত গান সে তার মগজে ভর্তি করে রেখেছিল। তার কাছে কোনও গানের খাতা ছিল না — সব ছিল মনের খাতায় ভর্তি। তার স্মরণশক্তি খুবই প্রখর। খুব গাঁজার ভক্ত। ঘণ্টায় তিন চার বার ছিলিম চাই। নানা মাপের কলকে। সে বলত, 'কৃষ্ণের বাঁশি দাদা'। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম এত গাঁজা খাও কেন? উত্তরে বলেছিল, "যাদের রজে বীজে আমার সৃষ্টি তারাই তো গাঁজা ছাড়া এক দণ্ডও থাকতে পারতেন না। মা ছিলিম খেয়েই বাবাকে চালান করে দিত।"

গত ২০০১ সালের ১৭ই অগাস্ট শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর সৌম্য চক্রবর্তীর 'জোড়াবাড়ি'তে গৌরের কাছে তার শিক্ষা দীক্ষার কথা শুনেছিলাম। তার মা এবং বাবার কথাও শুনেছিলাম একই দিনে। আমার বিশেষ অনুরোধে সেদিন সে গান শোনাতে এসেছিল। যদিও অনেক বারই সে সৌম্যের জোড়াবাড়ির বাড়িতে গান শুনিয়ে গেছে। গৌরের বাবার নাম ৺মাধব দাস, তিনিও খ্যাপা নামেই পরিচিত ছিলেন। মা ৺ললিতা খেপি। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান গৌর। আদি বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত লাভপুর গ্রামে — তার জন্ম সন তারিখ সে বলতে পারেনি। মা ভাল গান গাইতে পারতেন। মাত্র চার বছর বয়স থেকেই বাবার কাছে গানের শিক্ষা শুরু হয়। যখন গৌরের বয়স সাত বছর তখন মা পরমধামে চলে যান, বাবার সাথে বিভিন্ন আখড়ায় ঘুরতে ঘুরতে বিষয়পুর ভালকুঠিতে মাধবদাস খ্যাপার আশ্রম গড়লেন নতুন করে। গৌর ছিল শ্রুতিধর—চার পাঁচবার একটি গান শুনতে পেলেই সে গানটি মুখস্থ

করে ফেলতে পারত। বীরভূমের কোনও এক শ্মশানে প্রথমে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নেয় গৌর খ্যাপা—পরে আবার লিরিসে গ্রামে (আহমদপুরের কাছে) মনোরঞ্জন গোঁসাই-এর কাছে বৈষ্ণব মতে দীক্ষা হল। তৃতীয় বার দীক্ষা নিয়েছিল বেলুড়ের লালবাবার শিষ্য দেবমনি মহারাজার কাছে উদাস মতে।

গৌর খ্যাপার আরও হাজার অভিজ্ঞতার কথা, সুখ দুঃখের কথা বলেছে। দেশ বিদেশ ঘুরে ফিরে তাদের সংস্কৃতি শিক্ষা আচার ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কথাই আমাকে অনেকবার জানিয়েছে। যে অবহেলা জীবনভর সমাজ ও সংসার থেকে সে পেয়েছিল, সব কিছুকে তুচ্ছ করে খ্যাপা আপন পথেই চলেছিল আনন্দের সন্ধানে। বাউলগানের বাণী ও সুর তাকে পৌঁছে দিয়েছিল অন্য এক অচিন দেশে। একদিকে উদাসীন অন্যদিকে ছিল উদ্ধত — একদিকে শিল্পী অন্যদিকে ছিল এক পাকা কারিগর, সে কারণেই পার্থিব এই মাটিতে গৌর খ্যাপা সুর বেঁধে জীবন সংগ্রামে এক নির্ভীক সৈনিক। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয়, যে কারণে গৌর খ্যাপার মতো বাউল জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র অপঘাতে মৃত্যু বরণ করল সে সম্পর্কে দু চার কথা বলার চাহিদাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছি না। যে হেতু আমি দীর্ঘদিন গৌর খ্যাপার সঙ্গ করেছি এবং অনেক অনুষ্ঠানে তার জীবনযাপনের ধারা লক্ষ্য করেছি সে কারণে কিছু বক্তব্য রাখার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। পঞ্চাশ বছর ধরে যে মানুষটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছিল সে অকালে চলে গেল। তার পেছনে কিছু কারণ অবশ্যই লক্ষ্য করেছি।

আটের দশক থেকেই গৌর খ্যাপা যখন অনেক যন্ত্রণা, অপমান এবং অবহেলা পেয়ে নিজের চেষ্টাতেই একদিন আন্তর্জাতিক বাউল গায়ক হয়ে ওঠে তার পেছনে যথেষ্ট সাধনা এবং বেদনা ছিল। বাবা মাকে হারিয়ে ছেলেবেলা থেকেই সে আখড়ায় আশ্রমে কখনও আধপেটা আবার কোনও দিন অনাহারে দিন কাটিয়ে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্পী বাউল হয়ে উঠেছিল। মেলায় মোচ্ছবে গৌরকে পেলে সবাই তার

গান শোনার জন্য পাগল হয়ে উঠত। যেমন তার কণ্ঠ তেমন তার বক্তব্য রাখার অসাধারণ ক্ষমতা গড়ে উঠেছিল তার অজান্তেই। আলভাঙা মেঠো পথ ছেড়ে খ্যাপা কলকাতা ট্রেনপথে কিছু কবি সাহিত্যিকদের সাথে এল এবং সেই সঙ্গে দুর্গাপুর আসানসোল ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল থেকে তাকে বিভিন্ন আসরে গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর কারণে সাধনভজন ছেড়ে অর্থের গোলামি করা শুরু করে দেয়। সামাজিক নিয়মে সংসারের বন্ধন থেকে সে মুক্ত জীবনই পছন্দ করত। কিন্তু খ্যাতির জাঁতাকলে পড়ে গিয়ে অনেক অর্থ সে পেতে শুরু করে। গুরুবাদী সম্প্রদায়ের লোক নাম ও যশের কাঙাল হয়ে পড়েছিল। অর্থও এলো — কিন্তু সব গেল মদ, চরস, গাঁজার নেশায়। মদ তাকে ধ্বংস করে ছাড়ল। আমরা যারা গৌরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছি, তাকে মাতাল বানিয়ে মজা পেয়েছি সে কারণেই এই অকালে অপঘাতে তার মৃত্যু। আমরা বাউল নই। অথচ বাউলের নিজের জগত থেকে নামিয়ে এনে তাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে কী মজা পেলাম আমার জানা নেই! আর এক গৌর খ্যাপা সৃষ্টি হবে কি না জানিনা, তবে আমাদের সাবধান হতে হবে যদি সংস্কৃতি রক্ষা করতে হয়। যদিও বর্তমান সমাজ জীবনে তার লক্ষণ খুব একটা চোখে পড়ছে না।

বাউলদের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতায় লালায়িত করে তাকে আখড়া থেকে বার করে শহরের বাবু কালচারের সাথে মিলিয়ে দিতে তথাকথিত আঁতেলরা অতিমাত্রায় আগ্রহী। ক্ষয় ধরে গেছে বাউলের অন্তর্জগতে। তবুও আমি আশাবাদী, হয়তো কোথাও না কোথাও সাধনভজনের বীজ লুকিয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে — একদিন আবার মহাজনদের পদ গাইতে গাইতে বাউলরা পল্লবিত কুসুমিত হবে। জয়গুরু।

আর কীই বা করতে পারি

সৌম্য চক্রবর্তী

গৌর খ্যাপা কে কবে প্রথম দেখেছিলাম? মনেও পড়ে না।

মনে হয় ১৯৮৪ সালের পৌষ (ডিসেম্বর) মাসে। পৌষ মেলা প্রাঙ্গণের পিছনে বাউল আখড়ায় এক জায়গায় খড়ের ওপর কম্বল বিছিয়ে বসেছিলেন সনাতন দাস বাউল, বিশ্বনাথ দাস বাউল প্রমুখ। কথাবার্তা, গান, তামাক সেবা চলছিল। পাশেই আর এক কম্বল এর উপর আসীন এক তরুণ বাউল ও তার সহচরগণ। তরুণটি শ্যামল, মাথায় বেশ লক্ষণীয় ঝাঁকড়া চুল, গালের হাড় দুটো উঁচু, হাতে-বগলে গুবা। তারাও গান গল্পগুজব তামাক সেবা ইত্যাদি করছিল। মাঝেমধ্যেই এই দুই দলের মধ্যে কথা চালাচালি হচ্ছিল। হঠাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ দলের কোনও একটা উক্তিতে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে সেই তরুণ চিৎকার করে গালি দিতে লাগল, ''সনাতন বাউল, পূর্ণ দাস এদের সব জানা আছে...।'' তার পর সবল অশ্লীল ভাষা। আখড়া শুদ্ধ লোকের নজর ও কান তার দিকে, কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে অন্যান্য বাউলদের মধ্যস্থতায় শান্ত হয়ে সে আবার যথাস্থানে বসল। নাম শুনলাম গৌর খ্যাপা। তার শব্দের তোড়, তার ভাষার তেজ কিন্তু মনের মধ্যে গেঁথে গেল।

সেই থেকে ২০১৩ অবধি গৌর এর সাথে নানা সময়ে নানা জায়গায় দেখা হয়েছে। ক্রমশ তার ভাষার তেজের চাইতে তার গানের তেজের সঙ্গে বেশি পরিচিত হয়েছি, তার গাওয়ার অনন্য স্বকীয়তায় মুগ্ধ হয়েছি, নেশা লেগেছে। তার গানের বিপুল স্টক, তার স্মৃতিশক্তি, তার গুবা বাজানোর দক্ষতা, তার বাকপটুত্ব, যেমন উপভোগ করেছি

তেমনি বারবার অবাক মেনেছি। ক্রমশ বুঝেছি এক আশ্চর্য প্রতিভাবান শিল্পী অথচ সম্পূর্ণ ভাবে সামাজিক রীতিনীতি বহির্ভূত এক মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

কিন্তু বাউল সাধকের যে প্রশান্তি চেহারায় চোখে ও আচরণে প্রকাশ পায় (যেমন কেন্দুলীর তমালতলার সুধীর বাবা), গৌর তার সম্পূর্ণ উল্টো। বৈপরীত্যে গৌর একেবারে রাজকীয়। তার চোখ সত্যিই খ্যাপার চোখ, তার বাচনভঙ্গি শব্দচয়ন সম্পূর্ণ লোকবিরুদ্ধ অথচ তার বাউল-সাধনার জ্ঞানের কোনও খামতি নেই। বিনয় কোনও দিন তার ভূষণ ছিল না। নিচু বাঁধগোড়ায় তার বাসস্থানে গিয়ে দেখেছি একেবারে হতদরিদ্র সংসার। টাকাপয়সা জমানো সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। ভিক্ষার ঝুলি কখনও তার কাঁধ থেকে নামেনি, যদিও তাকে কখনও মাধুকরী করতে দেখিনি। (অগ্রজপ্রতিম প্রশান্তচন্দ্র রায় বলেছেন গৌর নাকি এক সময় দু হাতে টাকা উপার্জন করে চার হাতে বিলিয়ে দিয়েছিল।) দান গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ নয়, আবার দান করতে উদারমনা। প্রশান্ত রায়ের হাতঘড়ি চেয়ে নিয়ে গেল আবার সন্দীপকে নিজের গুবা দান করে দিল। এই ভাবে বহু সময় গৌর নানা লোকের সঙ্গে নানা জিনিস বিনিময় করে ব্যবহার করতেও দেখেছি।

গৌরের গান ঠিক কি রকম ছিল যাঁরা একবারও শোনেন নি তাঁদের বর্ণনা করে বোঝানো সহজ নয়। ... গৌরের গানে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা হল তার গানে প্রবল তেজ ও শক্তির ছটা, বিস্ময় সৃষ্টিকারী গলার রেঞ্জ, কুর্নিশযোগ্য তুলকালাম গান ও ব্যঞ্জনার সামঞ্জস্য। (পাঠিকা-পাঠক ইউটিউব-এ গেলে কিছু স্বাদ পাবেন।) পুরনো আমলের বাউল, যাঁদের গান শুনে বড় হয়েছি – নিতাই খ্যাপা, দীনবন্ধু দাস, সনাতন দাস, চিন্তামণি, তাঁদের থেকে গৌরের গান সম্পূর্ণ আলাদা। এঁদের গান এঁদের ব্যক্তিত্বের একটা অঙ্গ মনে হত, জীবনযাপনেরও অঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে গায়ক গৌর আর গানের বাইরের

গৌরকে আমার মনে হয়েছে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, আলাদা চরিত্র। যে গান গাইছে তার সঙ্গে ওর ব্যক্তিত্বের কোনও সামঞ্জস্য নেই। আবার কখনও ভেবেছি গানের এই গুরুদের মধ্যে হয়ত একটা বৈরাগী কম্পোনেন্ট আছে, তাঁদের তুলনায় গৌর হয়ত পরিপূর্ণভাবে সেই অদেখা বাউল খ্যাপা, যার উদাহরণ আমি আগে কখনওই দেখিনি, কিছু বর্ণনা পড়েছি মাত্র। ... গৌরের নামই তো "খ্যাপা"।

শান্তিনিকেতনে দুবার গৌরকে নেমন্তন্ন করে এনেছিলাম, একবার বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবনের একটি ছাত্র সম্মেলনে আর একবার এক অধ্যাপকের বাড়িতে গান রেকর্ড করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল গান শোনা, শোনানো এবং গৌরকে কিছু অর্থ সাহায্য করা। গৌর গাইল, কিন্তু দায়সারা ভাবে। এখন বুঝি, ছোট আসরে বা অচেনা বাবুদের সামনে একলা গাইতে গৌর স্বচ্ছন্দ বোধ করত না। ওর গানের আগুন জ্বলত বহু লোকের আসরে, বা প্রিয় সহশিল্পী ও বন্ধুস্বজনের সামনে।

একবার গৌর এক চেলাকে নিয়ে এল শান্তিনিকেতনের এক বাড়িতে। মেঝের উপর বসে কথা হচ্ছে, গৌর কথা বলছে, চেলা পাশে বসে আছে। হঠাৎ গৌর চেলার দিকে ফিরে কঠিন ভাবে বলল, "কী বললাম?" অর্থাৎ পরীক্ষা করছে চেলা মন দিয়ে শুনছে কি না, এবং বুঝছে কি না, এবং সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে কি না। মনে হল বাঃ, বেশ অভিনব শিক্ষকতার ধরণ তো!

গৌরের বড়-তামাক প্রীতি আজন্ম, তার বাপ মা নিত্য সেবা করতেন, এটা গৌরই কবুল করেছে।

তামাক সেবা কোন বাউল না করেন? শোনা কথা, বিদেশ ভ্রমণের সময় তামাকের অভাবে কেউ কেউ গৌরকে মদে আকৃষ্ট করেন। মদের সঙ্গে তার সম্পর্ক সেই যে শুরু হল দেশে ফেরার পর তা আর

কাটল না বরং তার সাথে আবার তামাক যোগ হয়ে গৌরের এই দুই বস্তুর ওপর নির্ভরতা দাসত্ব চরম স্তরে উঠল। গৌরকে দীর্ঘ দিন ধরে জানেন তেমন বন্ধুদের কাছেই এ কথা শুনেছি। একবার মেলায় দেখলাম ফকির আখড়ার পাশে, লোক চলাচলের রাস্তা থেকে কিছু দূরে, একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চালার মধ্যে গৌর বসে আছে, পাশে আরেক জন। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে সম্ভাষণ করতেই প্রথম কথা – "বোতল এনেছ?" যেন আমি ওর সরবরাহকারী। হয়ত সকলকেই একই কথা জিজ্ঞেস করছে। এ ছাড়া বহুবার তাকে দেখেছি মত্ত অবস্থায় উল্টোপাল্টা কথা বলছে, বাচন ভঙ্গি থেকে মনে হয়েছে মত্ত অবস্থাটা মদ থেকে, গাঁজা থেকে নয়। একবার পুজোর সময় এক টিভি স্টুডিওতে গিয়ে শট নেবার মুহূর্তে গৌর পকেট থেকে বোতল বের করে ফেলল, কর্মকর্তারা ছুটে এলেন, কিছুতেই তাকে বিরত করা যায় না।

গৌরের এই অভ্যাসের ফলে কিন্তু শহরের বাউলসঙ্গীতপ্রেমী কিছু মানুষ তার প্রতি অতিরিক্ত রকমের আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মেলায়, আখড়ায়, বাবুদের বাড়িতে তাকে ঘিরে আড্ডা জমেছে, তাঁরা তাকে রসদ উপহার দিয়েছেন, একত্রে বসে গানের ফাঁকে ফাঁকে সেবা হয়েছে। এতে গৌরের এক শ্রেণীর ভক্তসংখ্যা বেড়েছে বটে কিন্তু তার বিলক্ষণ স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। একে ঐ দারিদ্র্যের সংসার, তার উপর এ রকম মহার্ঘ অভ্যাস, নিশ্চয়ই একটি অন্যটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এ কথা মনে হয় তার পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

শান্তিনিকেতন পৌষ মেলায় গৌরকে কোনও দিন বাউল ফকির মঞ্চে উঠতে দেখিনি, যেখানে নাম লেখানোর জন্য ৭ই পৌষ সকালে শিল্পীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ইদানিং কালে তাকে মঞ্চের পেছনের বাউল আখড়াতেও ঢুকতে দেখিনি। বাউল-ফকিরদের দুই আখড়াকেই এড়িয়ে কোনও আলাদা জায়গায় নিজের স্থান করে নিত। কিন্তু গৌরের ১০০ মিটার এর মধ্যেই বাউল-ফকির শিল্পীদের কথার

স্রোতের, প্রোগ্রাম পাওয়ার বন্দোবস্ত সুপারিশের যে বিপুল তরঙ্গ বইছে তার প্রতি গৌরের কোন মনোযোগ ছিল না। রেডিওতে গাইবার জন্য কোনদিন আকাশবাণীতে ধরনা দিয়েছে বলে শুনিনি। (দু চার জন প্রাচীন বাউল এই রকম অবজ্ঞা আগে দেখিয়েছেন – প্রয়াত দীনবন্ধু দাস বাউলের বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয় : আকাশবাণীর গায়ে আমি হিসি করি।) বাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়িতে প্রোগ্রাম বাগানোর কোনও চেষ্টা করতে দেখিনি গৌরকে।

গৌরের করুণ পরিণতির পর কাগজ-টিভি-সরকার গৌরকে প্রচুর পাত্তা দিয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাকে ক্রমাগত খোঁচায়। গ্রামবাংলার প্রান্তবাসী, দরিদ্র, অভুক্ত এক যুবক নিজের কলিজা ও কণ্ঠের জোরে উঠে এসে শহরবাসী মধ্যবিত্তের নজর কাড়ল, তাদের বন্ধু হল, তাদের ভেতরে স্তাবক পেল, তাদের সাহায্যে বিশ্বের কাছে পৌঁছোল। কিন্তু তার সঙ্গে পেল এক নতুন বিষ, যেটা গৌর নিতে পারল না। তার শরীর ভেঙে গেল, তার গান নষ্ট হয়ে গেল, সে আবার মিলিয়ে গেল বিস্মরণে।

পৃথিবীর কাছে বাংলার অনন্য উপহার ধারক-বাহকদের জন্য আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহরবাসীরা এর চাইতে বেশি ক্ষতি আর কী করতে পারি ?

পুঃ গৌর, তোমার বাউলের বটুয়াটি কিন্তু আমার কাছেই রয়ে গেল।

ছবি : হিরণ মিত্র

প্রসঙ্গ গৌর খ্যাপা

বাউল-পথে, গৌর খ্যাপার একেবারে ছোটবেলার দোসর পবন দাস বাউল। তাঁর সঙ্গিনী মিমলু সেনও বহু অভিজ্ঞতার সাক্ষী। গৌরের মৃত্যুর পর, ২০১৩-র ডিসেম্বরে গৌর বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন স্রোতা দত্ত। সেই সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ।

পবনের কথা

ওকে যখন প্রথম দেখি, আমি ছোট ও-ও ছোট। ওই 'আমোদপুর' ইস্টেশনে আমার সাথে প্রথম আলাপ। কিন্তু বড় লাইনের ইস্টেশনে নয়, ছোট লাইনের কাটোয়া আর 'আমোদপুর' যে একটা ট্রেন যায়, ওই 'আমোদপুর' ইস্টেশনে ও গান গাইছিল। তখন ও একটা পায়জামা আর পাঞ্জাবি ... সাদা পায়জামা সাদা পাঞ্জাবি পরেছিল। খমকটা ছোটবেলা থেকেই খুব ভাল বাজাত। আমিও তখন গান বাজনা করি। ও আমার থেকে বড় তো, এই পাঁচ সাত বছরের বড়। ও তখন ধর এই পনের-টনের এরকম বয়স হবে। আর আমার তখন কত হবে? এই দশ-এরকম এগার ... এরকম বয়স হবে। তা ... তো গৌর ওই ইস্টেশনে গান গাইছিল। আমার খুব মজা লাগল। তা ওর সাথে আলাপ করলাম, বন্ধুত্ব হল। হ্যাঁ ... তা ও একটুকু ... খুব স্মার্ট, আর তার পরে ও তখন একটা সাদা চশমা পরেছিল আমার মনে আছে। মানে এমনিই তাতে ও একটা হিরো। আর কী আমার কাছে হিরো লাগছিল। তখন আলাপ হল। ওর গানটাও ভাল লাগল। তখন তারপরে আমাদের একটুকু-আধটু বন্ধু এবং খুব আমার সঙ্গে খুব ... আমি এই করি সেই করি, হ্যান ত্যান এই সব বড় বড় ... আমি এইসব জায়গা ঘুরেছি, এইসব মানে, আমি অমুক জায়গা, মানে দার্জিলিং গেছি, নৈনিতাল গেছি হ্যানত্যান এই সব। আমি তো তার নামও

শুনিনি। ওর ছোটবেলায় বাবা মা মারা গেছে।

তারপরে মাস দুই তিন বা এরকম একটা সময় ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তা একদিন সাঁইথিয়া ইস্টেশনে তখন ওকে দেখলাম। ও এক জায়গায় ইস্টেশনের পাশে শুয়ে আছে বা এরকম ... বসেছিল। হঠাৎ দেখা হল। ও একটা চট পরে আছে। গায়ে ঘা-টা সব পাঁচড়া-টাচড়া হয়েছে। তখন আমারও একটুকুন ওর উপর মায়া হল। আমি বললাম, 'তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে? আমার মা তোমাকে খুব ভাল করে দেবে। চল আমার সঙ্গে।' ওকে নিয়ে গেলাম। ও ছিল প্রায় .... দিন পনের-কুড়ি আমাদের বাড়িতে ছিল। তখন মা করত কী ... নিমপাতা-গরম জল করে, একদম ছেলের মত করে ভালবাসত। একই – কাছাকাছি তো। আর আমি দাদা, চিরদিনই ওকে দাদা বলতাম। তো আমার মা ওকে নিমপাতা গরম জল এসব করে টরে ওকে ভাল করে যত্ন করে ... তারপর সেরে গেল। তারপরে আবার কোথায় চলে গেল। কোনও ঠিক নাই।

জয়দেব মেলা

... এরকম করতে করতে আমাদের বন্ধুত্ব হল ... জয়দেব মেলা। গৌর আর পবন মানে একটা ই ছিল... এক জায়গায় যদি আমরা ... আর তখন তো জয়দেব মেলায় এত ভিড় থাকত না। আর তখন মাইকও ছিল না। ওই দুটো জায়গায় মাইক আসল। হ্যাঁ ... দুটো আখড়াতে। নামগুলো ভুলে গেছি ... একটা হচ্ছে ওই দুবরাজপুরের আখড়া ... দুবরাজপুরের আশ্রম। কার আশ্রম আমি ঠিক জানি না। ওটা হচ্ছে কাঙাল খ্যাপার এই দিকে একটা আশ্রম। ওখানে এখন আর সে রকম ওখানে গান বাজনা হয় না। আর নামটাও ভুলে গেছি। ছোট্ট তো! ওই জায়গায় গানের আসর ততটা হয় না। কিন্তু খাওয়া দাওয়াটা ওরা করায়। এই আর কী। ওরা মাইক-টাইক বাজাত। তারপর ওই মনোহর

খ্যাপার আখড়া ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে অন্যান্য আখড়ায়...তখন গৌর আর আমি, মানে প্রায় ওই দু'ঘণ্টা লাইন দিতাম। আমাদের, মাইকে আমাদের গানটা কেমন শুনতে লাগে। সেটা তখন ... মাইক মানে একটা বিরাট ব্যাপার। মাইক তখন নতুন আসছে। এখানে মাইকে গানবাজনা হবে। তাই অনেক আগে, লাইন দিয়ে গান-বাজনা করত। আমরা এরকম লাইন দিয়ে দু'ঘণ্টা পর আমরা গান-বাজনা করেছিলাম।

বন্ধুত্ব, আদান-প্রদান

একটা সময় মানে ও ... আমি যখন এই দিকে ট্রেনে গাই, আসা-যাওয়া করি। নানান এতে। একটা সমস্যা থেকেই। রোজগার করতে হবে আমাদের।

হ্যাঁ তখন ... মানে আমাদের তো ... জন্মভুমি আমার মুর্শিদাবাদ। ছোটবেলায় বাবা তো গ্রাম ছেড়ে দেয়। তখন সাঁইথিয়ায় এসে আমরা কিছুদিন ছিলাম। তখন আমি ট্রেনে গান গাইতে শুরু করি। মানে আমি ইস্কুল-টিস্কুল কিছু করতে পারি নাই। ও-ও কোনও দিন ইস্কুল...আমি তো নিজের থেকে নিজে পড়াশুনা করেছি। বাবা ... প্রথম পার্ট আর সেকেন্ড পার্টটা শেষে বাবা আমাকে বলেছিল, 'আমার পড়াবার ক্ষ্যামতা নাই। কিন্তু তুমি যা... এটা করেছ। এটাতেই তুমি এগিয়ে যাবে। তুমি নিজে চেষ্টা কর। তুমি আমার সব কিন্তু ক্ষ্যামতা নাই যে আমি তোমাকে ইস্কুলে দেব বা কিছু।' এই আর কী!

তা আমাদের মধ্যে সে রকম একটা ব্যাপার ছিল। রোজগার করতে হবে আমাদের ছোট থেকেই। একদিকে কী ভাবে গান-বাজনায় এগোব। কী করে গান-বাজনা শিখব। তখন তো আমার, গৌরেরও যে রকম ভাবে গুরু ছিল না। তা-ও গৌরের ছিল। গৌর – আমি তখন দু'জনেই অনেক ছোট। তখন ... তো আমরা কী ভাবে এগোব। তখন ও-ও লেখা পড়া জানে না ও-ও একরকম মুখস্থ গান ... একবার দু'বার

কেউ গাইলে, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নিতে পারতাম। না হলে একটুকু বলতাম যে, বলে দাও একটু কথাগুলো ... কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিতাম। নিয়ে আবার যে ভুল-টুল গুলো থাকত, সেগুলো সংশোধন করে নিতাম। তো এভাবে আমাদের চলতিতে আমাদের স্রোতের মধ্যে ... এভাবেই আমাদের শিক্ষাটা চলত। আমরা দেখছি, শুনছি, এভাবেই চলত। গানের গুরু তো আমাদের সে ভাবে ছিল না। আমার বাবা তো বাউল গান গাইতেন না। বাউল গান আমি নিজের পছন্দে নিজে ঠিক করেছি। বাউল গানের কথা, বাউল গানের যে বস্তু, সেগুলো খুব হৃদয়ে লাগত, হ্যাঁ, কথাটা কী বলছে। হ্যাঁ সেই চেতনগুলো নেওয়ার চেষ্টা করতাম। তারপরে যেটা বুঝতে পারতাম না, সেটা জেনে নিতাম। একটা গান, সেটা কেউ লিখে থাকে। সেটা যদি না বুঝতে পারি তো সে গানটা গেয়ে আমি কী করব? সেইটাকে না বুঝে তো গান গাইব না। ভাবটাই আসবে না। তাই আমরা নিজেকে অর্জন না করতে না পারলে আমি দোব কী? তো আমাদের সেই ধারা। তো সেইটা ... গৌরের খুব সেই চেতন ছিল। গৌর খুব ... ওর প্রচুর সংখ্যক গান ওর আয়ত্বে ছিল। কোনও দিন ওর কোনও জায়গায় ওর লেখিত কিছু ছিল না। আমারও সেরকম ছিল না। তা ...এইভাবে আমরা গান শিখেছি।

আমার থেকে বড় ছিল। চিরদিনই ওকে দাদা বলতাম। আবার মাঝে মাঝে ওকে রাগারাগি হলে ওকে টুকু তুই-টুইও বলতাম। ঝগড়া হত। রাগারাগি হত। কী... মানে... ওই হয়ত ও আমার গানটাকে ঠিক নষ্ট করে দিচ্ছে। 'তুমি আমার গানে এরকম করছ কেন? তোমার গানটাকে আমি এত সুন্দর করে দিচ্ছি।' হ্যাঁ ... তখন ও আবার হেসে বলছে, 'না ভাই এরকম কিছু ... রাগ করিস না।' এই ...। চিরদিনই খ্যাপা ছিল। দেখা হলে মুখে মুখে চুমু দিত। বাড়িতে গিয়েছিলাম একবার এই টালিগঞ্জের ওদিকটায়। চণ্ডীতলায়। বলল, 'আয় ভাই বোস। তুই আজ

এখানে থেকে যা। কেন যাবি।' কিন্তু রাতে একেবারে আলাদা। আবার সকালে যেমন ছিল আগে, ঠিক তেমন।

সম্পর্কটা তো ভালই ছিল। কিন্তু ওর নানা কাণ্ড। খালি বেকায়দা করত। তাইতো আমরা সব ছেড়েছুড়ে আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। ও আমাকে পেঁচিয়ে দিত। মানে ও এমনভাবে বাজাত, যেন আমি না এগোতে পারি। তাতে কী আর হয়?

শিল্পী-সাধক গৌর

আমার মন বলবে আমি গুরুকে কীভাবে দেখব। গৌরের তো অনেক শিষ্য আছে। দু'এক জন শিষ্য আছে। তারা তো গৌরকে সাধকই বলবে। আসলে গৌর সাধকই। ও তো সাধক ছাড়া নয়। এক সাধকের, তার কত শক্তি, কত জ্ঞান। সাধনা যেটা জীব জগতকে দিতে পারে না, সেটা শিল্পীরা দেয়। তা হলে তো সে সাধকই হবে। সাধকের জ্ঞান ক'জন নেবে? আমার মন গুরুর প্রতি। আমি সাধনার জ্ঞান পেলাম। কিন্তু সাধক তো আর গান গেয়ে সে জিনিসটা দিতে পারছে না। তা হলে যে শিল্পীর দ্বারা এর প্রকাশ, তাকে সাধক বলা যাবে না? বাউলরা তো সাধু। গৌর খ্যাপা অনেক জ্ঞানী। অনেক। সাধক শিল্পীই বলব। আর ওর ভেতরে যে জ্ঞান ছিল, সেটা কিন্তু ও তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতে পারত। সেটা বর্তমানে ও দাঁড়িয়ে দিতে পারত। আমি যেটা পারি না। ও কিন্তু সেটা পারত। গৌর যেটা গাইছে, সেটার কথা বিশ্লেষণও করতে পারত। কতগুলো জায়গায় ওর শক্তিশালী কতগুলো জিনিস ছিল।

সব গান সব জায়গায় বিশ্লেষণ করা যায় না। সবাই, সবটা একরকম ভাবে নেয় না। কলকাতার সমাজ মানে মিডিল ক্লাস। মিডিল ক্লাস অনেক কিছু নিতে পারে না। আবার সাধারণ -- যারা চাষী, তাদের কাছে আবার গানের পরিষ্কার বিশ্লেষণ করতে হবে। গৌর

এইখানেতেই জ্ঞানী। এই সূক্ষ্মতার খুব প্রয়োজন।

গান-জ্ঞান-গুরুতত্ত্ব

আমার প্রথম যে গুরু অনন্ত গোস্বামী। হ্যাঁ। তারপর সুবল গোঁসাই। তারপরে হরিপদ গোস্বামী... হ্যাঁ। এইভাবে আমাদের এসেছে। গৌরেরও তাই। তা সেই ভাবে ... গুরু তো পরে ... আমরা তো ... এটা তো সেইভাবে ... যেমন ... হরি গোঁসাই। উনি তো গানের গুরু না। উনি শিক্ষা গুরু, জ্ঞানের গুরু। গানও অবশ্য প্রচুর লিখেছেন। ওনার গান গাওয়া খুব মুশকিলও আছে। কী সুর দোব... সে সব... হ্যাঁ... যেমন সব গান। যাস না রে তুই হ্যরিয়্যার পুকুর পাড়। মানে হরি গোঁসাইয়ের নিজের নাম দিয়েই বলেছেন। হ্যরিয়্যার পুকুরটা হচ্ছে মা গোঁসাই। তাই ওইখানে বলছে হ্যরিয়্যার পুকুর, মানে যোনি। হ্যাঁ হ্যারিয়ার পুকুর মানে তাই। তা'লে এই যে বস্তু ধারা, তা সেগুলোকে বুঝতে হলে তো তার তত্ত্বজ্ঞান থাকতে হবে। এগুলো জানতে... তার জন্যেই তো গুরু ধরতে হয়। গুরু জ্ঞান। তার জন্যই শিক্ষার গুরু। বলছে, দীক্ষাগুরু একজন। কিন্তু শিক্ষাগুরু আমি হাজারটাও করতে পারি। হ্যাঁ শিক্ষা গুরু হওয়ার তা কোনও এ নেই। তা সেইসব জ্ঞান যদি আমি অর্জন করি, তখনই আমি বলতে পারব, এই জিনিসটা এই। তা গানের তত্ত্বগুলো বলা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক যে গুরুর শিক্ষা, সেগুলোকে তো... তাছাড়া শিল্পী জগত আর সাধক জগত দুটো আলাদা। আমরা শিল্পী, গানের সাধনা আমরা করেছি। তা-ও কতটুকু করেছি আমি জানি না।

আসলে বাউল একটা ধাঁধাঁ। এই দেহকে নিয়ে যে ধাঁধাঁ। তার জন্য শিক্ষা দরকার। হ্যাঁ ... গুরু না হলে তো শিক্ষা হবে না। এই গুহ্যতত্ত্ব জানতে হলে এই দেহটাকে গুরুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। না হলে

শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। গুরুর প্রতি যদি আস্থা-বিশ্বাস না থাকে তা'লে আমি সেটা পাব না। গুরু দিতে পারবে না। লজ্জা-ঘেন্না-ভয়, তিন থাকতে নয়। একেবারে লতার মতো করে গুরুর কাছে এই দেহটাকে সমর্পণ করতে হবে। তারপরই গুরু রাস্তা দেখাতে পারে।

শহুরে মেলা - মোচ্ছব

এই কলকাতা শহরে যে সব খেলা হয় না। যেটা আশ্রম বা আখড়া। যে সব মেলা মহোৎসবে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব আছেন, সেখানে এ সব খেলা হয়। এখানকার – এখানে মিলে এক রকম। একটা গল্প বলি। একটা গান আছে। আমরা দুজনেই গাইতাম। গৌরও গাইত। আমিও গাইতাম। একই সাথে আমরা গাইতাম। গানটা হচ্ছে – 'ঊর্দ্ধেতে ফল নারাকলের জল / পাত্র বিশেষ রয়েছি / বাঁকা নদীর তুফান থেমেছে।' কথাগুলো ভুলে যাচ্ছি।... 'ওরে নদীর মুখে নল/বলি নল বেয়ে জল পড়বে না গো / যার গুরুর কৃপা হয়েছে...

এই যে কথা। তা'লে এইসব গান এগুলো তো প্রশ্নোত্তরের গান। আখড়ায় এর বিশ্লেষণ হয়। নানা তত্ত্ব আসে। এখানে যদি এ গানের বিশ্লেষণ হয় তবে সাধারণ মানুষ নিতে পারবে না।

সেবার কলকাতার এক ক্লাবের এক জন এসে বললেন, 'সেক্স নিয়ে গান গাওয়া যাবে না।' কতগুলো জায়গায় বিশ্লেষণ করল তারা অন্যভাবে নেবে। সব গান সব জায়গায় বিশ্লেষণ করা যায় না। সবাই সবটা একরকম ভাবে নেয় না। বাউলগানের কথা একভাবে বলা হয়, আর বাঙালিরা ক'জন সেই তত্ত্ব বুঝতে পারে? এই তত্ত্ব আবার বিশ্লেষণ করতে গেলেও ঝামেলা। মানুষ বলবে যে খারাপ। তা তো নয়। খারাপ তো নয়। এতো দেহকে নিয়ে, দেহতত্ত্ব নিয়ে। দেহ হচ্ছে গীতা। দেহ হচ্ছে ভান্ড-ব্রহ্মাণ্ড। তা, দেহকে জানতে পারলেই এগুলো

বোঝা যায়। একবার এক মঞ্চে গান হচ্ছে। তো পার্বতী বাউল গান গাইছে। ও গাইছিল সাধন তত্ত্বের জ্ঞান। তা একজন দর্শক বললো, দেহতত্ত্বের গান শুনতে চাই। তা আমি বললাম, এটা তো দেহতত্ত্বের গানই হচ্ছে ভাই... এই তো হচ্ছে দর্শক। এই যে তোমরা করছ। তার আগে বোড়ালে যখন আমরা করতাম। তার আগে কি কলকাতায় সেভাবে বাউল গান শোনা হত? তারপর তো বাউল ফকির উৎসব। তোমাদের এই উৎসবেও তো দেখেছি। ব্রাহ্মণরা রান্না করে। ওদের মাছ খেতে দেওয়া হয়। এসব বাউল চলে না। এ সব ঘটে না। তা-ও তো চলছে।

মিমলুর কথা

ওকে আমরা শেষ দেখি শান্তিনিকেতনে। বোলপুর স্টেশনে। দূর থেকে দেখি, এক সাধু স্টেশনের কাছে একটা গাছের মগডালে উঠে বসে আছে। নিচে দাঁড়িয়ে ওর এক শিষ্য। ও গাছে উঠে বসে দেখছে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস থেকে কে নামল। তাকে খপ করে ধরবে। শেষের দিকে ও ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিল। শুনেছি ওর মারা যাওয়ার কয়েক মাস আগে নাকি ও রেল লাইনে মাথা দিতে গিয়েছিল। ও এতটাই desperate হয়ে গিয়েছিল।

ওর অনেক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আমরা যারা ওর কাছাকাছি ছিলাম তারা ওকে ঠিক মতো কাজে লাগালাম না। আমার মনে হয় যে, যেটা আমি লক্ষ্য করেছি as a witness, এই দীপক দা, গৌতম দা যখন গৌরকে বন্ধু বানিয়ে ফেলল, ওদের মধ্যে একটা hero worshipping-এর ব্যাপার ছিল। It's a very very masculine mode. সেটা গৌরের উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে। গৌর was a natural hero! But where this heroism was going to take him, সেটা

মানে ওর যদি অন্যরকম guidance থাকত, then it wouldn't take him to narcissism. আমার একটা জায়গায় গিয়ে মনে হয় যে গৌরের development থেমে গেল। ও দেখল, আমি ভগবান হয়ে গিয়েছি। আমি সেই জায়গায় পৌঁছোতে পারছি, আমি আকর্ষণ করছি। আরোপ করতে পারছি গৌরের মধ্যে affection ছিল, ভালবাসা ছিল। ও একদম মাটি হয়ে যেতে পারত। তারপরে রাক্ষস হয়ে যেতে পারত। He had a tremendous power of transformation. যেটার জন্য ও প্রত্যেকের কাছে প্রতীকের মতো হয়ে গেল। বিশেষ করে এই কয়েকজনের কাছে। গৌর was a natural poet ও যখন-তখন improvise করছে। ও যখন তখন ও এমনভাবে প্রকাশ করেছে যে মানে প্রত্যেককে ... মানে ও নিজে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াত।

1983 : On the way back from the mela at Pathurchapuri. Deepak Majumdar, Gaur and Bruno.

1983 : Gaur, Bruno, Deepakda Paramita Ukil.

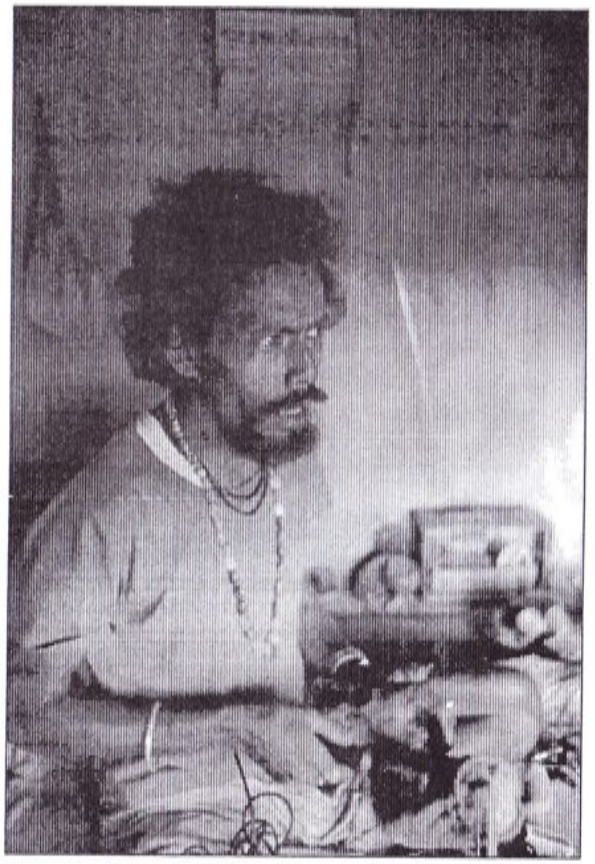

1989 : At Gaur's House in Matiari, not everyone knew that Gaur was a Great tinkerer and fixer of Gadgets such as radios and tape-recorder.

খ্যাপার কারখানা

সকালে চিড়ে

All dressed up and striding around his para while being filmed.

সুবল গোঁসাই
ছবি সৌরজিৎ রায়

সুবলদা

লীনা চাকী

বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থেকে মেঠো গান বুকে করে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন সুবল দাস — আমাদের সব্বার সুবলদা, কারও সুবল গোঁসাই। সেই মেঠো গানের বাহক হয়ে এপারে এসেছিলেন, সঙ্গে রেখেছিলেন আজীবন, যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলেন — তাঁর গানের উত্তরাধিকারী কেউ হতে পারল না। যোগ্য গানের শিষ্য কেউ হয়নি, যে সুবলদার গায়কীকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাউল জগতে এটাই তো হয়। প্রত্যেকেই পূর্ণতা খোঁজে নিজের গানে, অনুপ্রবেশ ঘটে না অন্য কারও গায়কীর। অবশ্য সুবলদার সেই মেঠো গানকে টিকিয়ে রাখা খুব মুশকিল ছিল। তার ওপরে ভাষায় ঢাকাইয়া টান একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন — 'কালো ম্যাঘে আকাশ গ্যালো ছাইয়া / তুমি ক্যামনধারা নাইয়া' — এসব গান এপারের মানুষের আমলে গাইতে লজ্জা করত।'

হাতে বিড়ি, মাঝে মাঝে ফুক ফুক টান। বজ্রাসনের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে, সুবলদা অন্যমনস্ক, শৈশবে ফিরে গেছেন। সেই যে গানটা মা-বাবার সঙ্গে মাধুকরী করতে বেরিয়ে গাইতেন, সেটাই নীচু স্বরে গাইছেন — 'গৌররূপের যাই বলিহারি/ও নাগরী/রূপে একা ভুলি নাই গো/ভুলেছে পুরুষ-নারী। আমি চুপটি করে বসে। গান শেষ। মাথা তুলে বললেন, 'ও হো হো। কি সব গান ছিল। মানে তো বুঝতাম না, গ্যায়ে যেতাম।'

স্মৃতিচারণে তিনি মাইলের পর মাইল হেঁটে চলে যাচ্ছেন বাউল,

কীর্তন গানের আসরে, বিচ্ছেদী গান শুনে কেঁদে ভাসাচ্ছেন, ঘুরে ঘুরে গান শুনছেন। সে গানের ভক্ত হচ্ছে মাঠ-খাটা মানুষেরা। তাঁকে বলছে, 'তোকে কাজ করতে হবে না, আলে বসে গান কর।'

তেমন ভক্ত তো আমরাও ছিলাম। সেই আঁকাড়া গান — যোগী ভিক্ষা চায় না, কথাও কয় না। যোগীর মনে কী তা ভেঙে কয় না। / যোগীর হতে লোটা / মাথায় জটা রে / যোগীর কপালে সিন্দুরের ফোঁটা / ভিক্ষা ধর রে' — শোনালেন দু'হাতের করতল প্রসারিত করে মাথা নাড়িয়ে। গানের ভাব এলে যেমনটি প্রকাশ হয় আর কী। এই ভাবটা অনেকেই দেখেছেন। ভরা আসরে বাউলদের নাচন, ডুবকি - খমকে তোলপাড়, চিৎকৃত স্বর — সুবলদা চুপটি করে আসরের কোণে বসে, মাথা নীচু, মাঝে মাঝে ভুরু তুলে রঙ্গ দেখছেন। মন হলে উঠলেন, না হলে উঠলেনই না। আর উঠলে? তাঁর ভক্ত-শ্রোতারা টানটান। 'বৃন্দাবনের পথে যাব মন / পথ দেখাবি কে।' টুকটুক করে ডুবকিতে টোকা, ঘুরছেন মাঝে মাঝে, অতি ভাব এলে 'ইহ্' ধ্বনি। সুবলদা নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা হয়ে।

সেই যে, তাঁর কথায় 'পূবালি মেঠো' সুরের গান, সেই সুরের দাসানুদাস হয়ে থেকেছেন। গেয়েছেন বটে এপার থেকে পাওয়া বাউল গান, কিন্তু শিকড়ের রসটুকুকে মেরে ফেলেননি।

একবার, তিনি চলে যাওয়ার বছরখানেক আগে আড়ংঘাটায় তার বাড়িতে সন্ধেবেলায় গানে বসলেন। বললেন, 'আমার দেশের গান, রেকর্ড করে রাখ, ভাল গান।' সেদিনও তিনি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন দেশ-গাঁয়ের মাটি খেতে পাওয়া গানে।

সেদিন নয়, পরে একদিন, আমাদের বাড়িতে বসে হঠাৎই বললেন, 'বিচ্ছেদী গান শুনতে শুনতে আমিও একখান লিখে ফ্যাললাম। মনে

থাকতে থাকতে লিখে নাও, আমি গাইতে থাকি।' গানটা, আপনারা যাঁরা সুবল গোঁসাইকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের জন্য দিলাম।

কৃষ্ণ তুমি মথুরাতে যেও না / কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে সখীগণ আর বাঁচবে না। / আমরা তোমায় ভালবাসি / সকলই তো জানো তুমি / জেনেশুনে পাগল তুমি হোয়ো না। / কদমতলায় বস্ত্রহরণ / করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণধন হে, / জীবন-যৌবন সব দিয়েছি জেনেও কি তা জানো না।। / সুবল দাসের এই মিনতি / দিয়ো তোমার চরণদুটি /বুকে ধরে রাখব আমি পুরাও মনের বাসনা।।'

...চালাকি আর বোকামি
বাবু হও আর কর গোলামি
দিয়েছ কি তাঁর সেলামি
যে দেখছে মন দেখার মতো।...

শব্দ, বিপজ্জনক ও আক্রান্ত শব্দ বিষয়ে ভাবনা

সুকান্ত মজুমদার

আরও একটি অলস বছরের শেষে, আমরা বাউল ফকির উৎসব-কর্মীরা যখন নড়ে-চড়ে বসলাম, তখন দোষের মধ্যে এই যে অসুখ-জর্জরিত আমি বলে ফেলেছিলাম, এবারের পত্রিকায় অসুখের শব্দ নিয়ে লিখব। আমাদের পত্রিকার এবারে আবার নতুন সম্পাদক। স্বধর্ম পালনের তাড়নায় তিনি নতুন মুসলমানকেও দশ গোল দিয়ে যখন আমাকে তাড়া করলেন, বুঝলাম আরও একটি বসন্ত পার করেও কাণ্ডজ্ঞান আমার সেই তিমিরেই।

তাই খাতা খুলতেই হল।

আর এটুকু কৈফিয়ত এই কারণেই যে, লেখাটা এই মেলার পত্রিকায় মনে হয় একটু খাপছাড়াই হল। সম্পাদক আমাদের সেই ছাত্র-জীবনের বন্ধু। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে একা ছাড়াটা এই বাজারেও সমীচীন হবে না বলে মনে হয়। এ লেখা ছাপার দায় তাঁর একার নয়, যে সময়ে এই পত্রিকার কাজ শুরু করে শেষ করতে হয়েছে, তাতে আমি একটা কবিতা লিখলেও মনে হয় বেচারাকে ছাপতে হত। তার চেয়ে এই ভালো হল। বলাই বাহুল্য এরপরে সব দায় ক্রেতা ও পাঠকের।

অসুখের শব্দ বলতে, আমি আমার অসুখের সময়ে, অখণ্ড অবসরে শোনা, আশপাশের চেনা শব্দের perception-এর কথাই বলতে চেয়েছিলাম। আসলে বলতেও কাউকে চাই নি, কথাটা মাথায় ঘুরছিল। দিনের পর দিন যাদবপুর ইস্ট রোডের চার তলার ঘরে বসে থাকতে থাকতে নানা কিছু দেখছিলাম, শুনছিলাম।

জানলা দিয়ে আসা রোদ টেবিলের উপর রাখা বই-পত্তর, বিবিধ কাগজ, কম্পিউটার, হাবিজাবি আরও কত কী কী-র উপর দিয়ে আস্তে আস্তে সরে যায়, আশপাশের বাড়ির কলিং বেল বাজে, গ্যারেজের শাটার খুলে গাড়ি বেরোয়, ফেরিওয়ালারা আসে, দু-একটা পাখির কিচিরমিচির শোনা যায়, একটা বিশেষ কাক – যে মাঝে মাঝেই পাশের বাড়ির ছাতে জলের ট্যাঙ্কের ধারে বসে অজানা পাখির গলায় ডেকে ওঠে বিচিত্র শব্দ করে। হয়ত কাকেরা এ রকম করে থাকে, আমি জানি না, নাকি ওর অসুখ অথবা মাথা খারাপ – কে জানে! পাড়ায় কিছু বাড়ি থাকবেই, যাকে ইংরেজিতে বলে loud। তাদের সব কিছুই প্রয়োজনের তুলনায় জোরে অথবা জোরটাই তাদের প্রয়োজন– কে জানে! বেল বাজছে তো মনে হচ্ছে আমাদেরই ঘরে বাজছে। কথা বলছে তো মনে হচ্ছে ঝগড়া হচ্ছে। সে এলাহি ব্যাপার। আমরা ছোটবেলা কিঞ্চিত স্বাস্থ্যবান ও ব্যস্তবাগীশ এক বন্ধুকে খ্যাপাতাম, "বসা তো নয় উপবেশন" বলে। সেইরকম খানিকটা। কর্মকাণ্ড যাকে বলে।

সকালের আধো ঘুমে, কাজের লোকেদের বিভিন্ন বাড়িতে বেল বাজানো, আর পরিচিত ফেরিওয়ালাদের ডাক শুনে বুঝে যাই মোটামুটি ক'টা বাজল। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের অনেক শব্দ সাময়িক বন্ধ হতে থাকে। সামনে বাড়ির ঘটঘটে উইন্ডো এসি কখন একদিন বন্ধ হয়ে যায়। এখন তার মাসখানেকের বিশ্রাম। মাথার উপর ফ্যান বন্ধ হয়। প্রায় না-শুনতে-পাওয়া অনেক শব্দ আবার জেগে ওঠে পরিযায়ী পাখির মতো। বছরের এই দু'একটা মাসই তারা শ্রুতিগোচর হয়, তারপর আবার ঢাকা পড়ে যায়, ফ্যান, এসি, কুলার ইত্যাদি কানের কাছে ঘুরতে থাকা বিবিধ যন্ত্রের দাপটে। দূর থেকে আসা পুজোর ঘণ্টা, ক্ষীণ শাঁখ, রাত্তিরে ট্রেনের হর্ন, পাড়ার মেয়েদের মেসে অফিসের রাতের শিফট শেষ করে ফেরা কাউকে নামাতে আসা শাটল গাড়ির ঘর্ঘর ও তার সঙ্গে পাড়া-পাহারাদার কুকুরদের

চ্যাঁচামেচি, দুপুরে বাবুদের ড্রাইভারদের গুলতানি থেকে ভেসে আসা এফ-এম রেডিও, পরিচিত চিলের ডাক–সবকিছু এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে বছরের এই সময়টায়, মনে হয় এরা কি আগেও ছিল? সারাবছর থাকে? সামনের বাড়ির কার্নিসে পায়রার আনাগোনা, বসে থাকা দেখি, কিন্তু তাদের দুপুরের অলস ডাক শোনা যায় না অন্য সময়। বছরের এই সময়টা এত এত চেনা-অচেনা শব্দে ভরে থাকে যে, শুনতে শুনতে প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প তৈরি হয় মনে মনে। একতলার বাচ্চাটার কথা বলার প্রবল চেষ্টায় চিল চিৎকার শুনি সকাল বিকেল। তারপর হঠাৎ একদিন পিঁক-পিঁক-পিঁক-পিঁক এলেমেলো আওয়াজ। ও কি হাঁটতে শিখে গেল? বেল বাজল– মানে কি অমুকদের বাড়িতে কাজের লোক এল? নাকি সেলসম্যান, না ধোপা, নাকি সিইএসসি মিটার রিডিং-এর লোক, যিনি সব বাড়িতেই একসঙ্গে বেল বাজান। ফলে দরজা খুললে তাঁকে দেখা যায় না, কারণ তিনি তখন অন্য বাড়িতে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে খুবই হম্বিতম্বি করেন মিটার না দেখে চলে যাবেন বলে। বেল বাজাবারও আবার ধরন আছে। অনভ্যস্ত, নতুন কেউ এলে বোঝা যায় বেলের আওয়াজ থেকেই। সুইচ চেপে রেখে দেবার ফলে টিং-টং এর বদলে টিং ক্র-ক্র-ক্র-ক্র-টং করে চ্যাঁচায় বেচারা বেল। ব্যস্তবাগীশ লোক এলে টিং-টং-টিং-টং। একবার বাজানোতে তাঁরা বিশ্বাসই করেন না। সাবধানী, কিন্তু-কিন্তু টাইপের লোক হলে, টিং... ব্যাস ওইটুকুই।

বছরের এই সময় আরো একজন জানান দিতে থাকে সে আছে। সে আমাদের রেফ্রিজেটর। ফ্যান-ট্যানের প্রভাবে তার অস্তিত্ব তেমন টের পাওয়া যায় না অন্য সময়। এখন দিনের বেলা তো বটেই, রাতের নৈঃশব্দ্যের সুযোগে তার কী গোঁ গোঁ গর্জন। টানা এরকম শব্দ শুনলে কীরকম যেন অস্বস্তি হয়। রাতে ঘুম ভাঙলে মনে হয় আফগানিস্তানে সেনা ক্যাম্পে ঘুমোচ্ছি। সত্যি, বাড়িয়ে বলছি না। অভিজ্ঞতা থেকেই

বলছি। ওখানে তাঁবুর ভিতর এসি, কাছেই বিরাট পাওয়ার-স্টেশন ধরনের কিছু, (কিছু একটা কায়দা করেছে ব্যাটারা। আফগানিস্তানে ঘোরতর লোডশেডিং হয়, নিজে দেখেছি। সেনা-ক্যাম্পে ওসবের বালাই নেই।) মাথার উপর কপ্টার, ড্রোন—সব মিলিয়ে একটা অস্বস্তিকর গোঁ গোঁ হতে থাকে, যার কোনও তুলনা পাওয়া মুশকিল। বাড়ির পাম্প আর একটি যন্ত্র, বেশিরভাগ বাড়ির মতোই আমাদের বাড়িতেও তার স্থান, সিঁড়ির নীচের ঘুপচিতে। ঐ গভীর থেকে উঠে আসা এরকম অপার্থিব hum দিয়ে সে জানান দেয়, সে আছে। মাঝে খারাপ হয়েছিল। সারিয়ে ফেরার পর শুনি আওয়াজ বদলেছে। একটা ঘর্ঘর-ঘর্ঘর শব্দ যোগ হয়েছে সেই মারাত্মক hum এর সঙ্গে। আমাদের পাড়ার শব্দপটে ইদানিং একটা নতুন শব্দও শোনা যাচ্ছে। আজান। দূর থেকে ভেসে আসছে, সময় বিশেষে বেশ স্পষ্টই। হয়ত আশেপাশে নতুন মসজিদ হয়েছে বা মসজিদ ছিলই, সংস্কার করে নতুন মাইক বসিয়েছে।

আর আছে আমাদের প্রাণাধিক টেলিভিশন। সময়ে-অসময়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে সে চলেছে ক্লান্তিহীনভাবে। জীবন মানে বিশেষ চ্যানেল থেকে শুরু করে, আড্ডা, তর্ক, সিরিয়াল ও খেউড়ে ভরপুর দেদার মজার এই বস্তু থেকে যে অবিরাম শব্দস্রোত প্রতিনিয়ত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, তার তুলনা বিরল। আর কেউই তো আস্তে শোনেন না। তাঁদেরই বা দোষ কী? অবিরাম হর্ন আর নানাবিধ শাব্দিক অত্যাচার এই শহরের মানুষের শ্রবণযন্ত্রের যে দশা ঘটাচ্ছে, সে ইতিহাস খুবই করুণ। আমাদের পাড়ার পাহারাদার কুকুরগুলোর আবার রসবোধ অতুলনীয়। এরকম ছিল না যদিও। কেউ এক রসিকচূড়ামণি দলে যোগ দিয়েছে মনে হয়। পাড়ার দু'একটা বাড়িতে পুজোর খুব ধুম। প্রতিদিন ঘটা করে নিত্যপুজো হয়। আর পুজো শেষে যেই ভোঁ করে শাঁখ বেজে ওঠে, তার সুরে সুর মিলিয়ে শুরু হয়ে যায়

কুকুরদের সম্মিলিত সঙ্গীত। সে এক শোনবার মতো জিনিস। ভৌ-ও-ও-ও-ও-ও-ও-ও আর ভৌ-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ-এর এক মায়াবী কোরাস। তার সঙ্গে টিং টিং ঘণ্টার মৃদু সঙ্গত। সকাল সন্ধে দুবেলা শোনা যায়।

আর একটি শব্দ এই শহরকে গ্রাস করেছে বেশ কিছুদিন। নির্মীয়মান বাড়িগুলিতে পাথর কাটার যন্ত্রের বিকট আওয়াজ। আমাদের এখানে আশেপাশের ছোট বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বা ফাঁকা জমিতে বহুতল— এই কর্মকাণ্ড প্রায় শেষের দিকে। তারপরেও দুপুরের নিভৃতিতে দূর থেকে ভেসে আসা তীব্র ক্রি-ক্রি-ক্রি-ক্রি-ই-ই-ই-ই বহু অস্থির দিন স্মরণ করায়। গরমকালের দুপুরে কানের কাছে ঐ রকম আওয়াজ একটা বেশ জব্বর রকম শাস্তি বই কী! যাঁরা এই কাজ করেন তাঁদের অকাল বধিরতা তো নিশ্চিতই। আর লোকালয়ে এই ধরনের যন্ত্র চালানোর অনুমতি যে দেশে মেলে, সে দেশ যে চিরকাল উন্নয়নশীলই থেকে যাবে, উন্নত আর হবে না, সেও নিশ্চিত!

যে যাদবপুরে লোকে রিকশা চাপা পড়ার ভয়ে রিকশায় চড়ে, সেখানে এতক্ষণ রিকশার হর্নের কথাই বলা হয়নি। এই যন্ত্রটি বাজানোতে কোনো কোনো রিকশাওয়ালা বিরাট দক্ষতা অর্জন করেছেন। তবে চলতি প্যাটার্নও অনেক আছে। প্রবল গতিতে সাঁ করে গলির মোড় ঘুরবার সময়, ধীর চালে চলার সময়, হঠাৎ পাশ কাটানোর সময় এবং আরো নানা সময় তাঁরা নিজেদের মুড, দিনের বিশেষ সময় ও ট্রেন ধরার তাড়া অনুযায়ী, বিভিন্ন সুরে ও তালে যন্ত্রটি বাজাতে পারেন। পাড়ার কেউ বাজার করে ফিরলেন, না গলি দিয়ে প্রাণ হাতে করে রিকশা চেপে সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন, দিব্যি বোঝা যায় বাড়িতে বসে।

ময়লা ফেলার গাড়ির গড় গড় আওয়াজ, বাঁশি, কাকেদের হল্লা-এই দিয়ে সকালটা শুরু হয়। বেলার দিকে আর একজন আসে সামনের

ফ্ল্যাটবাড়িতে। সে ওই বাড়ির প্রাইভেট ঝাড়ুদার। ওই বাড়ির সামনের রাস্তার অংশটুকু ঘস ঘস করে ঝাঁট দেয়।
বেলা বারোটা-সাড়ে-বারোটা হল, বোঝা যায় সেই শব্দে। পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন-কণ্ঠীদের নিয়ে রাতভর জলসার রেওয়াজ মনে হয় এখনও আছে। শীতের সময় একটু রাতের দিকে, সেই স্কুল-কলেজের সময়কার সুপারহিট গানের কলি হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসে। যাঁদের কানের কাছে এসব চলে রাতভর, তাঁদের জন্য গভীর সহানুভূতি নিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আহা–আধো ঘুমে ঐসব গান যেন চুলে বিলি কেটে নিয়ে যায় কোন স্বপ্নের দেশে।

আচ্ছা আমাদের মেলার গানও কি অনেক রাতে কাউকে নিয়ে যায় এমন সফরে? আমি তো সবসময় সামনে থেকে শুনি, এবারে একটা সুযোগ আছে গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে শোনার–হয়ত একটা বহু-চেনা গানের সুরে দুলে উঠব আধো ঘুমে।

সারাদিন এই বিচিত্র শব্দ-জগতের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে, শুনতে শুনতে এই শহরের শাব্দিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা ভাবি। সিনেমায় কলকাতা দেখানো মানেই যেমন ট্রাম, টানা-রিকশা আর হাওড়া ব্রিজ, শব্দ দিয়ে কিভাবে উপস্থাপিত হয় এই শহর? ট্রামের শব্দ? টানা-রিকশার ঘন্টি? সে তো আছেই। আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই মনে হয় কলকাতার ট্র্যাফিকের কথা। শহরের বাইরে কিছুদিন থেকে এই শহরে ফিরলে এই ব্যাপারটা বেশ টের পাওয়া যায়। কলকাতার ট্র্যাফিকের একটা নিজস্ব শব্দ আছে। আর কোথাও এই ঘনত্বে ও সংখ্যায় অ্যাম্বাস্যাডর চলে না। তার ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে আমাদের সেই কবেকার আত্মীয়তা। দোতলা বাস, কাটা তেলের অটো, স্কুটার - এসব তো তার নিজস্ব শব্দ নিয়ে হারিয়েই গিয়েছে। যোগও অবশ্য হয়েছে অনেক। লম্বা ফ্লাইওভারে উঠলেই ট্র্যাফিকের

শব্দে হাইওয়ের উদ্দামতা। এসেছে মেট্রো। সেও সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে চড়েছে ফ্লাইওভারে। শহরের শব্দপটে যোগ হয়েছে নতুন শব্দ, যা আগে অচেনা ছিল।

এই চেনা-অচেনা-হারানো-নতুন শব্দের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে এল। আমাদের খুব পরিচিত আর শ্রদ্ধেয় একজন sound artist পিটার কিউস্যাক। পিটার অবশ্য নিজেকে sound artist না বলে বলেন sonic journalist। পিটারের একটা বিখ্যাত প্রজেক্ট হল, favourite sound project। একটু আগেই যে কথাটা হচ্ছিল, যে সব শহরেরই একটা নিজস্ব শব্দপট আছে, একটু মন দিয়ে শুনলে যেটা দিব্যি শোনা যায় – পিটার সেটাই ধরার চেষ্টা করেছিলেন। একটা শহরের বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সেই শহরে শোনা, তাঁদের প্রিয় শব্দ কোনটি? বেশ কয়েকটি শহরে এই কাজটি পিটার করেছেন–লন্ডনে, বেজিং-এ, টোকিওতে, আর রেকর্ড করেছেন সেইসব বিচিত্র শব্দ, যে সব শব্দের কথা মানুষ তাঁকে বলেছেন। হয়ত অনেক হারিয়ে যাওয়া পথের কথাও এসেছে, যা রেকর্ড করা যায়নি, যা শুধু ধরা আছে শহরের প্রাচীন মানুষজনের স্মৃতিতে।

কলকাতায় আমার-আপনার প্রিয় শব্দ কী কী?
যে সংস্কৃতিতে "শোনা" প্রক্রিয়াটিই এত অবহেলিত, সেখানে খুব কৌতূহল হয়, মানুষ কীভাবে শব্দ দিয়ে এই শহরকে স্মৃতিতে ধরে রাখছেন, তা জানতে। সময় কিন্তু খুব বেশি নেই। যে বিশ্ব-সংস্কৃতির দাপটে "শোনা" আর কোনো আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া থাকছে না, কানে-শামুক-গোঁজা একটা ভীষণ ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে দ্রুত, তাতে শ্রবণের স্মৃতি বলতে ঠিক কী থাকবে আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পর, সেকথা কল্পনাতেও আনা যায় না। হয়ত এক শ্রেণির মানুষ থাকবেন, যাঁরা কলকাতায় থেকে, সারা জীবনে অজস্র কাক দেখেও

জানবেন না, কাকের ডাক ঠিক কী রকম শুনতে, শব্দের মিউজিয়াম বানাতে হবে হয়ত!

পিটারেরই আর একটা কাজ আছে, 'Sounds from dangerous places' বলে। মানুষ তার গভীর অধ্যবসায় ও জ্ঞানচর্চায় যা জানতে পারে, সবসময়ই অজানা থেকে যায় তার থেকে বেশি। আর সেই অর্ধেক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রশ্ন এসে পড়লেই তার সঙ্গে যোগ হয় ব্যবসায়িক বুদ্ধি, লোভ, রাষ্ট্রনৈতিক ফিকির ইত্যাদি কত কিছুই। তার ফল হচ্ছে চেরনোবিল, ভোপাল, জাপানের ফুকুশিমা দাইচি। এখানেই এর শেষ নয়। আরও এই ধরনের ঘটনা ঘটবেই। ভয়াবহ বিপর্যয়ের ফলে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত বা এমনিতেই ভারী শিল্পের নানা বিপদ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অঞ্চলগুলিতে পিটার গিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন। এইসব অঞ্চলের শব্দ শুনে, রেকর্ড করে, বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করেছেন এর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত।

এই 'Sounds from dangerous places'-এর কথা এসে গেল আসলে আর একরকম বিপদগ্রস্ততার কথা মনে হল বলে। যেখানে শব্দ নিজেই বিপদগ্রস্ত, endangered। আমাদের চারপাশের শব্দ-জগৎ তার মতো করে অজস্র কথা আমাদের বলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা পড়ে গিয়েছি এমন এক ফাঁদে, যেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। 8B মোড়ের আপাত chaos এর আড়ালে যে শাব্দিক symphony-অজস্র গাড়ির অজস্র রকমের ইঞ্জিন—নতুন, পুরোন, ধুঁকতে থাকা, আদুরে, উদ্দাম, কর্পোরেট, গম্ভীর, খলখলে; এত মানুষের কথা—অর্থহীন, অর্থবহ, প্রেমের, অপ্রেমের, ব্যবসায়িক, সাময়িক; এত ধরনের চলা—দ্রুত, মন্দ, উদ্ধত, অপরিণত, এত ফোন, এত হর্ন, এত বাজানোর ধরন এবং আরও কত কিছুর মিশেলে যে একই সঙ্গে খুব জটিল ও মজাদার শব্দ-জগৎ, তার

থেকে ভেসে আসা অসংখ্য ইঙ্গিত—এর থেকে আমরা কি ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না? নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখছি একভাবে। কানে শামুক গুঁজে বিভোর। সেখানে 'বহু'-র জায়গা নেই। পোশাকে-আশাকে, ভাষায়, ব্যবহারে যে একমাত্রিকতার পুজো চলছে, শোনার প্রক্রিয়ায় আর তার ব্যতিক্রম থাকবে কী করে।

কিন্তু আমরা যে শিকার হয়ে গেলাম। কীসের?

পিটারের 'Sounds from dangerous places' নামে একটা বইও আছে। সেখান থেকে কিছু কথা তুলে দিলাম। অনুবাদের আর চেষ্টা করছি না। উনি যেসব বিপজ্জনক জায়গায় কাজ করেছেন—চেরনোবিল, আজারবাইজানের তৈলক্ষেত্র, ইউকের পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ইত্যাদি নানা জায়গায়; এইসব জায়গায় আবহ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনায় বলেছেন—

'They all sound the same. Their sonic presence in the landscape is almost identical wherever they are. It may seem unremarkable, trivial even, but I now find it particularly significant in terms of the information that environmental sound provides to citizens. This relentless broad-range hum of massive extractors is increasingly heard elsewhere too. Industrial complexes, oil refineries, major corporate buildings in cities, even mega shopping malls, transmit a similar presence. It often goes with restricted access and the latest security. If one is looking for a sound that represents the underlying power behind today's global financial, industrial and military elites, then this is it. It is not necessarily loud, but constantly present — unchanging, featureless, soulless, utterly authoritarian and rarely touched by the small sounds of life.'

With Compliments from:

Since 1760

Lewis Berger

Paint your imagination

BERGER PAINTS INDIA LIMITED
BERGER HOUSE
129, Park Street, Kolkata 700 017